ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা

এম এন রায়

অনুবাদ
বদিউর রহমান

প্যাপিরাস

দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৯
প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রকাশক
মোতাহার হোসেন
প্যাপিরাস
১৮ আজিজ কো-অপারেটিভ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬১২২৮৩

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

অক্ষর বিন্যাস
আই.আর. কম্পিউটার সার্ভিসেস
৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫

মুদ্রণে
রিকো প্রিন্টার্স
৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মূল্য
৮০.০০ টাকা

ISBN 984-8065-62-8

Historical Role of Islam by M N Roy: Translated by Badiur Rahman Published by Motahar Hossain, Papyrus, 18 Aziz Co-operative Super Market, Shahbagh, Dhaka-1000. 2nd Edition May 2009. Price Tk. 80.00 & US $ 10.00

উৎসর্গ

যতীন সরকার

এই অনুবাদকের

উপন্যাস ও জনগণ
এরিস্টটলের পোয়েটিক্স
হোরেসের আর্স পোয়েটিকা
লঙ্গিনাসের সাহিত্যতত্ত্ব
প্লেটোর কাব্য ভাবনা
ধ্রুপদী সাহিত্যতত্ত্ব

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

কোনো বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণকে নবজন্ম কিংবা নতুন দিগ্বলয় বলা যায়। এম এন রায়ের 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ কিছুটা রোমাঞ্চকরও বটে। কারণ বইটি এতোটা পাঠকপ্রিয়তা পাবে তা ভাবনায় ছিল না। বইটির রয়েছে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব। হিন্দু-মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যোগসূত্রের এটি একটি চমৎকার বিষয়। উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম সম্বন্ধে কতোটা অজ্ঞ, বইটি পড়লে সে বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এম এন রায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত এই লেখা তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। গড়ে উঠেছিল একটি রেডিক্যাল সমাজও। বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় ইসলামের গুরুত্ব তুলে ধরায় মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও এম এন রায়ের লেখায় নতুনভাবে ইসলাম সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ফলে তৎকালীন দৈনিক আজাদকে কেন্দ্র করে উঠেছিল মুসলিম রেনেসাঁ সোসাইটি।

এম এন রায়ের বিপ্লবী জীবনে অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। অনেক ভাষায় ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান; আর ঘুরেছেনও বহু দেশ। বিরল অভিজ্ঞতা এবং বিচিত্র জ্ঞানাধিকারের ফলে বইটি হয়ে উঠেছে যৌক্তিক ও তথ্য সমৃদ্ধ। বইটি উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব কমানো এবং অতীতের অনেক বেদনাদায়ক স্মৃতি মুছে ফেলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এম এন রায় বলেছেন— 'শত শত বছর ধরে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একটি দেশে একই সাথে বসবাস করল, অথচ পরস্পরের সংস্কৃতি সভ্যতা সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার চেষ্টাই করল না।' বইটি প্রকৃতপক্ষে সেই সহানুভূতির দ্বার খুলে দেয়ার একটি চাবিকাঠি বিশেষ।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে পাঠক, প্রকাশক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা।

বদিউর রহমান
ঢাকা ০৯.০৯.০৯

প্রসঙ্গ কথা

ভারতবর্ষে মানবতাবাদী আন্দোলন এবং রেনেসাঁর প্রবক্তা এম এন রায়। লেনিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি, বুখারিন প্রমুখের সাথে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জওহরলাল নেহরু এবং সুভাস বসুর সাথে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২-তে আমস্টারডামে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংঘের তিনি ছিলেন প্রথম সহ-সভাপতি। আইনস্টাইন প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সাথে তার ছিল সরাসরি ব্যক্তিগত যোগাযোগ। তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া, মার্কসিস্ট ওয়ে, হিউম্যানিস্ট ওয়ে, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্স, রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট প্রভৃতি জার্নাল সম্পাদনা করেন। মানবতাবাদ, রেনেসাঁ, রুশ বিপ্লব, আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক পরিণতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু বই লেখেন। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ যেমন চীন, রাশিয়া, ম্যাক্সিকো, আমেরিকা, দূরপ্রাচ্য ও ইউরোপিয়ান দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি রাষ্ট্র থেকে চার্চের সম্পর্কহীনতার এবং সকল পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রবক্তা।

এক অসাধারণ মানুষ এম এন রায়, পুরা নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু এ তাঁর প্রকৃত নাম নয়। প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাবা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ছিলেন স্কুল শিক্ষক। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার আড়বেলিয়ায় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ। বাবার স্কুল আড়বেলিয়ার জ্ঞানবিকাশিনী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু। দশ বছর বয়সে ১৮৯৭-তে ভর্তি হন মাতুলালয় কোদালিয়ার অ্যাংলো-সংস্কৃত বিদ্যালয়ে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আঠারো বছর বয়সে যোগ দেন গোপন বৈপ্লবিক দলে। বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওই অঞ্চলে এলে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল পরিচালনা করার অপরাধে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁকেসহ সাত ছাত্রকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেন। বিতাড়িত হয়ে ভর্তি হন জাতীয় বিদ্যাপীঠে। সেখান থেকেই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। ভর্তি হন যাদবপুরের টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে।

পরের বছর ১৯০৭-এ চংড়িপোতা রেল স্টেশনে (বর্তমান সুভাষনগর) রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে গ্রেফতার হন। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় মামলায় তিনি মুক্তি পান। মজঃফরপুর ও মুরারিপুকুর বোমা মামলায় অধিকাংশ নেতা-কর্মী ধরা পড়লে নরেন্দ্রনাথ বাঘা যতীনের সহকর্মী হিসেবে আবার গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯১০-এ আবার ধরা পড়েন এবং

মামলায় প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে তিনি যোগ দেন সাধু-সন্ন্যাসীর দলে; ঘুরে বেড়ান বিভিন্ন এলাকা। অল্পদিনের মধ্যেই আবার যুক্ত হন বাঘা যতীনের বিপ্লবী দলের সাথে। শুরু করেন সাংগঠনিক কার্যক্রম। এবার সংগঠন গড়তে থাকেন ভারতে এবং ভারতের বাইরে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের বিপ্লবীরা ইংরেজের শত্রু জার্মানদের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে দেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থের জোগান দিতে বেছে নেন ডাকাতির পথ। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি এবং ২২ ফেব্রুয়ারি গার্ডেনরীচ বেলিয়াঘাটায় পরপর দুটি ডাকাতির সর্দারের দায়িত্ব পালন করে চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এই ডাকাতির মামলা থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে বাঁচানোর জন্য নেতা যতীন্দ্রনাথ ও পূর্ণদাসের আদেশে রাধাচরণ প্রামাণিক স্বীকারোক্তি করলে তার জেল হয় এবং বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক নিয়ে জেলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সি. মার্টিন ছদ্মনামে বাটাভিয়া যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য বিদেশের সাথে যোগাযোগ। এই মাসেই উত্তর ভারতের বিপ্লবী দল অবনী মুখার্জীকে জাপান পাঠায়। নানা জায়গায় নানাজনের সাথে যোগাযোগ করে জুন মাসের মাঝামাঝি সি. মার্টিন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এর মধ্যে বিদেশি জাহাজে করে গোপনে ভারতে অস্ত্র আমদানির কথা সরকারের গোয়েন্দারা জেনে ফেলে। শুরু হয় ব্যাপক ধর-পাকড় ও তল্লাশি। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আত্মগোপন করেন এবং এক বিপ্লবী সহকর্মীর সঙ্গে ১৯১৫-র ১৫ আগস্ট আবার দেশত্যাগ করেন। পথে তার সহযাত্রী ধরা পড়েন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নাম পরিবর্তন করে হরি সিং নামে ফিলিপাইন চলে যান।

ফিলিপাইন থেকে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আবার নাম পরিবর্তন করে মি. হোয়াইট নামে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নতুন চীনের জনক সান-ইয়াৎ-সোনের সাথেও এসময় তার দেখা হয়। সেখান থেকে কিছু অস্ত্র স্থলপথে ভারতে পাঠানোর চেষ্টা করেন। ধরা পড়ার ভয়ে জাপানি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পিকিং চলে যান। পিকিংয়ে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে একদিন হাজতবাস করেন। পরের দিন ব্রিটিশ কনসালকে ধাপ্পা দিয়ে মুক্ত হয়ে চলে যান ইউনান প্রদেশে। সেখান থেকে গোপনে চলে যান জাপানের রাজধানী টোকিও। দেড় বছর ঘুরে বেড়ান দূরপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশ। ১৯১৬-তে তিনি যান সানফ্রানসিসকো। যেদিন সানফ্রানসিসকোতে পৌঁছেন তার পরের দিনই খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় : 'রহস্যময় ভিনদেশি আমেরিকায়। বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বিপ্লবী না বিপজ্জনক জার্মান গুপ্তচর?' (Mysterious Alien Reaches America. Famous Brahmin Revolutionary or Dangerous German Spy?) ফলে হোটেল ছেড়ে পালাতে হয় নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। এবার আশ্রয় নেন পালো আল্টোতে। সেখানে থাকতেন বিপ্লবী নেতা যাদুগোপালের ভাই ধনগোপাল। ধনগোপালের আশ্রয়েই

থাকেন কিছু দিন। তাঁরই পরামর্শে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবার নাম গ্রহণ করেন 'মানবেন্দ্রনাথ রায়' সংক্ষেপে এম. এন. রায়। এখানেই বিয়ে করেন ইভেলিন ট্রেন্টকে।

ইতোমধ্যে আমেরিকা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মান গুপ্তচর বলে গ্রেফতার শুরু করে। এ সময় ভারতের পক্ষে প্রচারের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণরত লালা লাজপত রায় এবং মানবেন্দ্রনাথ আমেরিকার রেডিক্যালদের সংস্পর্শে আসেন। সেখানে তাদের প্রভাবে তিনি মার্কসবাদ পড়তে শুরু করেন এবং মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। এই সময় আমেরিকায় থাকা নিরাপদ নয় বুঝে তিনি মেক্সিকো যান এবং সেখানে সোশালিস্ট পার্টি সংগঠিত করে এর সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। মেক্সিকোয় মানবেন্দ্রনাথ একজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি মেক্সিকোর সোশালিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তর করে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির প্রবর্তক/প্রতিষ্ঠাতার সম্মান লাভ করেন। মেক্সিকোকে তিনি বলতেন দ্বিতীয় মাতৃভূমি। তিনি ল্যাটিন আমেরিকায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আঞ্চলিক ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন।

মেক্সিকোয় তার কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ লেনিন বোরোদিনের মাধ্যমে তাঁকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানালে এম. এন. রায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ডি. গার্সিয়া ছদ্মনামে মেক্সিকো ছাড়েন। বার্লিন প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরে পরের বছর মস্কো পৌঁছেন। ১৯২০-এ মস্কোয় মে দিবসের সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেন। মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি লেনিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমে তিনি রাশিয়ার প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিকদের একজন হিসেবে গণ্য হন। তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এশিয়া ব্যুরো প্রধানেরও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২০-এর জুলাই মাসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের উপনিবেশ বিষয়ক থিসিসের সঙ্গে একমত না হতে পেরে এম. এন. রায় নিজস্ব ভিন্ন থিসিস দেন। কংগ্রেসে লেনিনের থিসিসের পরিশিষ্ট হিসেবে এই থিসিস গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসেই তিনি পার্টির 'স্মল ব্যুরোর' সদস্য নির্বাচিত হন। 'স্মল ব্যুরো' পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট সংস্থা। নির্বাচিত হন কমিন্টার্নের মধ্য-এশিয়ার ব্যুরো সদস্য। সেই বছর ১ থেকে ৮ জুলাই বাকু শহরে অনুষ্ঠিত হয় মধ্য-এশিয়ার সম্মেলন। এম. এন. রায় সে সম্মেলনে যোগ না দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রসহ তাসখন্দ যান। এবছরই তাসখন্দে গঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাত সদস্যের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

তাসখন্দের থিবা শহরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর কয়েকজন পলাতক সৈন্য এবং ইরানি বিপ্লবীদের সংগঠিত করে লাল ফৌজের একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তোলেন। এই সেনাবাহিনী দিয়েই তিনি মেশেদ-কোয়েটা সড়ক ও ট্রান্সকাস্পিয়ান রেলপথের কয়েকশ মাইল শত্রুমুক্ত করেন। যার ফলে এই অঞ্চল ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত হয় এবং সোভিয়েত সীমান্ত নিরাপদ হয়। তার হস্তক্ষেপে

বোখারায় সোভিয়েত সরকার গঠিত হয়। তিনি দুঃসাহসিক ফরগনা অভিযানে নেতৃত্ব দেন এবং বিজয়ী হন।

১৯২২-এ মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে তিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হন। এর পরপরই মস্কোয় 'টয়লার্স অফ দ্য ইস্ট' নামে বিদ্যালয় খোলা হলে তিনি এতে উচ্চ পদ লাভ করেন।

এর আগেই প্রকাশিত হয় অবনী মুখার্জীর সাথে যৌথভাবে রচিত India in Transition' গ্রন্থ।

এই বছরই (১৯২২) করাচিতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি তার কর্মসূচি পাঠান। এই নথি নিয়ে যান তাঁরই গোপন দূত নলিনী গুপ্ত (কুমার)।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দেই তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার কার্যকরী কমিটির বিকল্প সদস্য এবং ১৯২৪-এ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২৩-এ ভারতে শওকত ওসমানি, মুজফ্ফর আহমেদ প্রমুখের নামে যে ষড়যন্ত্র মামলা হয় মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন তার প্রথম আসামি।

১৯২৪-এ লেনিনের মৃত্যুর পর চীনদেশে বিপ্লব পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে বোরোদিকে সাহায্য করার জন্য তাকে চীনে পাঠানো হয়। কিছুদিন কাজ করার পর বোরোদিকের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দেয়। যার ফলে ১৯২৭-এ তিনি চীন থেকে বহিস্কৃত হন। এই ঘটনার পর থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনে তাঁর অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৮-এ কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে তার অনুপস্থিতিতেই তার বিরুদ্ধে 'নিন্দাপ্রস্তাব' নেয়া হয় এবং কমিন্টার্ন থেকে বিতাড়িত হন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ 'ডিকলোনাইজেশন থিসিস' রচনা। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রন্ডলার নামে এক জার্মান বন্ধুর পত্রিকায় 'কমিন্টার্নের সংকট' শিরোনামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। এই প্রবন্ধে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে তার বিরোধিতা প্রকাশিত হলে তিনি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারত প্রবেশ করেন ডা. মাহমুদ ছদ্মনামে। এ সময় তিনি দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ৭ মাস কাজ করেন। আত্মগোপন অবস্থায় ১৯৩১-এর জুন মাসে আবার ধরা পড়েন মুম্বাই শহরে। অপরাধ, ভারত সরকার উচ্ছেদ ও ব্রিটিশ আধিপত্য হরণের ষড়যন্ত্র। তার জবানবন্দিতে ব্রিটিশবিরোধী নানা তথ্য তুলে ধরেন। বিচারে বারো বছর জেল হয়। আপিল করলে তা কমিয়ে ছয় বছর করা হয়। দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পান ১৯৩৬-এর ২০ নভেম্বর।

কারাগারেও নিশ্চুপ বসে থাকার মানুষ নন এই কর্মব্যস্ত মানুষটি। কারাবাসকালেই গড়ে ওঠে তাঁর বিখ্যাত দর্শন 'ফিজিক্যাল রিয়ালিজম'। এবছরই ফৈজপুর কংগ্রেসে যোগ দেন সম্মানিত অতিথি হিসেবে। প্রায় চার বছর কাজ করেন ভারতীয় সম্মেলনে, কংগ্রেসের সদস্য হয়ে। এ সময় কংগ্রেসকে গোঁড়া নেতৃত্ব

থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি অবস্থান নেন গান্ধীর বিপরীতে। কংগ্রেসের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন গান্ধী মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম আযাদের বিরুদ্ধে। ১৯৩৭-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গঠন করেন 'লিগ অব রেডিক্যাল কংগ্রেসম্যান'। বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে মতভেদের কারণে ১৯৪০-এ কংগ্রেস ছেড়ে ওই বছর ডিসেম্বরেই গঠন করেন রেডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পিপলস্ পার্টি। এর প্রস্তুতি হিসেবে মে মাসে দেরাদুনে দু সপ্তাহের এক অধ্যয়নচক্রের আয়োজন করেন। এতে ভারতের প্রায় অর্ধশতাধিক প্রাজ্ঞজন ও বৈজ্ঞানিক রাজনীতি নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। তাঁর এই আলোচনা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'Scientifics Politics' বা 'বৈজ্ঞানিক রাজনীতি' নামের পুস্তিকা।

১৯৪৪-এ কলকাতায় রেডিক্যাল পার্টির বার্ষিক অধিবেশনে এম. এন. রায় এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। তার এই ভাষণের নাম ছিল 'The last battle for freedom' বা 'মুক্তির জন্যে শেষ যুদ্ধ'।

আরও আগে তিনি প্রকাশ করেন 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া' নামে পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৭-এর ৪ এপ্রিল। দুই বছর প্রকাশের পর তিনি এই পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট'।

মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রথমে সশস্ত্র বিপ্লব, পরে মার্কসবাদ, শেষে মানবতাবাদে দীক্ষিত হন। তিনিই সোশালিস্ট ভ্রাতৃসংঘের প্রথম ভারতীয় সদস্য।

ইউরোপে থাকতে তিনি 'ভ্যানগার্ড', 'ম্যাসেস', 'এডভান্স গার্ড' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার চালাতেন।

১৯৪৬-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত রেডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির' সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৭-এর ২৩, ২৪ ও ২৫ মে পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে তিনি পার্টির 'ঘোষণা' উপস্থাপন করেন। এই ঘোষণাই তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা 'নিউ হিউম্যানিজম'।

শেষ জীবনে 'নব মানবিকতাবাদ' নামে এক মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা, গ্রামে-মহল্লায়, কলে-কারখানায় আঞ্চলিক জনসমিতির ভিত্তিতে লোকায়ত গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন, ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দল ও তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ইত্যাদি ছিল তাঁর এই মতবাদের মূল কথা।

শেষ জীবনে তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী ইউরোপীয় কৃষক সমিতির সম্পাদিকা এলেন গটসচেককে নিয়ে দেরাদুনে বসবাস করতেন।

এর আগে প্রথম স্ত্রী ইভেলিন ট্রেন্টের সাথে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ইভেলিন একসময় তার রাজনৈতিক কাজকর্মে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৯১৯-এ ডি. গার্সিয়া ছদ্মনামে মেক্সিকো ছাড়ার সময় এবং মস্কোয় অবস্থানকালে ইভেলিন তার সাথে ছিলেন।

এম. এন. রায় ১৭টি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনেকগুলো বই লিখেছেন। তাঁর রচিত ৬৭ গ্রন্থ এবং ৩৯ পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তার অসমাপ্ত জীবনস্মৃতি।

১৯৫৪-এর ২৫ জানুয়ারি দেরাদুনে এই মহান মানুষটির জীবনাবসান ঘটে। তার মৃত্যু নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা একটি কার্টুন ছেপেছিল। এই কার্টুনে ছিল সিংহের ছয়টি ছবি। তার বর্ণনা ছিল এরকম : সুন্দরবনের সিংহ ; ইন্দোনেশিয়ার সিংহ; যুক্তরাষ্ট্রের সিংহ; যার নিচে লেখা ছিল 'ইন পাওয়ার বাই প্রোক্সি'; মস্কোতে রাশিয়ান ভাল্লুক লেনিন আর ভারতীয় সিংহের কোলাকুলি; এবং সবশেষে দেরাদুনে হিমালয়ের পাদদেশে মৃত অবস্থায় সিংহ, যার নিচে লেখা ছিল 'দ্য লোনলি লায়ন দ্যাট রোর্‌ড্ এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড।

দুই

মানবেন্দ্রনাথ রায় 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' লেখেন ১৯৩৯-এর দিকে, যখন তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছিলেন। এসময় তিনি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দল হিসেবে কংগ্রেসকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় এই বই। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৯-এ।

এই সময় মানবেন্দ্রনাথ রায় বাঙালি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই জনপ্রিয়তার দুটি কারণ। একটি গান্ধীবিরোধিতা আর অন্যটি 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' রচনা। আবুল কালাম আযাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সভাপতির পার্থী হওয়ায় মুসলিম লীগ প্রেস আযাদকে নয়, রায়কেই সমর্থন করে।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সেসময় কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে এক সংবর্ধনা প্রদান করেন। এই সংবর্ধনায় নেতৃত্ব দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক এবং দৈনিক আজাদ সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁ। সেসময়ের বহু তরুণ মুসলমান নেতা-কর্মী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অনুসারী ও অনুগামী হন। মুসলিম ছাত্রলীগের একদল মেধাবী ছাত্রনেতা আজীবন রায়ের অনুসারী হয়ে থাকেন। তাদের বলা হতো রায়পন্থী বা রেডিক্যাল।

মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের নবজাগরণের জন্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রস্তাব ও উদ্যোগে গড়ে ওঠে আজাদ-কেন্দ্রিক মুসলিম রেনেসাঁ সোসাইটি।

দৈনিক আজাদ সেসময়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে।

বইয়ের ভূমিকায় তিনি লেখেন : 'ইসলামের (মোহামেডানিজম) আকস্মিক উত্থান এবং নাটকীয় বিস্তৃতি মানবেতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বর্তমান চরম সময়ে এই অধ্যায়ের আবেগহীন এবং পক্ষপাতমুক্ত অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এর অনুশীলন এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ। আর সাধারণ জ্ঞানানুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পড়লেও এ থেকে যে কেউ অনেক উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসে ইসলামের যথার্থ ভূমিকা এবং মানব সংস্কৃতিতে এর অবদান বর্তমান ভারতের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথভাবে জানা, যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।

এদেশে এখন বহু মুসলমানের বসবাস। আমরা খুব কমই ভেবে দেখি যে, যে কোনো এক মুসলমান শাসিত দেশের চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান ভারতবর্ষে বসবাস করেন। মুসলমানরা এদেশে আসার বহু শতাব্দী অতিবাহিত হলেও অনেকে এই বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীকে বহিরাগত বলেই মনে করে। ... মূলত মুসলমানরা এদেশে এসেছিল আক্রমণকারী হিসেবে। তারা দেশ জয় করেছে এবং শত শত বছর শাসন করেছে। বিজয়ী এবং বিজিতের সম্পর্ক আমাদের ইতিহাসে এমন প্রভাব ফেলেছে যে, আজ উভয়পক্ষই সমান বিব্রতবোধ করে। কিন্তু বর্তমান পরাধীনতার সমদুর্দশাভোগ অতীতের সেই অপ্রীতিকর সংস্কৃতিকে অনেকটা ঝাপসা করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্যে যেমন, মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্যও তা কম বেদনাদায়ক এবং ক্ষতিকর নয়। মুসলমান শাসনের দিনপঞ্জি ইতিহাসের অপরিহার্য অধ্যায় হয়ে ওঠায় ভারতীয় জাতিসত্তার মুসলমানরা অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন।' (অধ্যায় এক)

এই বক্তব্যের মধ্যেই এম এন রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক সময়ের ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি তথা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানের বিভাজন আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্তই করবে। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর এই বইয়ে। এছাড়া দুই সম্প্রদায়ের মানুষের পারস্পরিক সংহতি প্রতিষ্ঠারও এক মহান উদ্দেশ্য ছিল 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' রচনার পেছনে। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে মুসলমানদের অবস্থানের কথা যেমন বলেছেন তেমনি বলেছেন মুসলমানদের সম্বন্ধে হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তার কথায় ; 'শত শত বছর ধরে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একই দেশে একই সাথে বসবাস করল, অথচ পরস্পরের সংস্কৃতি-সভ্যতা সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টাই করল না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই আর পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোনো সভ্য জাতিই হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এত অজ্ঞ নয়। ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও কেউ পোষণ করে না।'

'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা'-য় ভূমিকা ছাড়া আরও ছয়টি অধ্যায় আছে; এগুলো হল : ১. ইসলামের ব্রত, ২. ইসলামের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি, ৩. বিজয়ের কারণ, ৪. মোহাম্মদ ও তার শিক্ষা, ৫. ইসলামী দর্শন এবং ৬. ইসলাম ও ভারতবর্ষ। এই ছয়টি অধ্যায়ে মানবেন্দ্রনাথ ইসলামের ধর্ম, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র, রাষ্ট্র শাসন, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে তিনি কোনো পক্ষাবলম্বন করেননি। উদার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ব্যাখ্যা করেছেন ইসলামের বিভিন্ন দিক।

বইয়ের উপসংহার টেনেছেন তিনি এভাবে : 'বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস পড়লে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের উন্নাসিকতাকে হাস্যকর বলে মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে অবমাননা করে এবং দেশের ভবিষ্যৎকে আহত করে। মুসলমানদের কাছে শিখেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতা হয়ে রইল। এমনকি আজও এর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা অতীতের ঋণ স্বীকার করতে লজ্জা পায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইসলামের ঐতিহ্য থেকে ভারতবর্ষ তেমন উপকৃত হতে পারেনি; কারণ এরকম সম্মানের অধিকারী হবার যোগ্যতা তাদের ছিল না। এখনও এই বিলম্বিত পুনর্জাগরণ সৃষ্টির বেদনায় মানব ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে প্রেরণা নিয়ে ভারতবর্ষবাসীরা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, ব্যাপক লাভবান হতে পারেন। মানবসভ্যতায় ইসলামের দান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ওই দানের ঐতিহাসিক মূল্যের যথার্থ অনুধাবন হিন্দুদের উদ্ধত আত্মপ্রসাদের মূলে আঘাত করবে এবং আমাদের এই যুগের মুসলমানদেরও সংকীর্ণ মানসিকতামুক্ত করে, তারা যে ধর্মে বিশ্বাসী, তার যথার্থ মর্মবাণীর মুখোমুখি করে দেবে।' (অধ্যায় সাত)

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে, ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা বক্তব্যের সাথে সবাই একমত হবেন এমন ধারণা অমূলক। তবুও বিস্তর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একজন অমুসলমান প্রাজ্ঞজনের দৃষ্টিতে ইসলামের মূল্যায়ন কম গুরুত্ব বহন করে না। সে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' পড়লে যে কোনো পাঠক তার মননে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেন। এই প্রতীতি নিয়েই বর্তমান প্রয়াস।

এছাড়া বর্তমান বিশ্বে ইসলাম সম্বন্ধে ক্রমাগত যে নতুন ভাবনা, বিশেষ করে শান্তিকামী মানুষের মনে যে দ্বিধা সংকোচ সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমাগত, শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে যেভাবে চলছে অশান্তি সৃষ্টির নানা মহড়া তাতে এম. এন. রায়ের ভাষায়ই কেবল বলা যায় : (এই বই) 'আমাদের এই যুগের মুসলমানদেরও সংকীর্ণ মানসিকতামুক্ত করে, তারা যে ধর্মে বিশ্বাসী, তার যথার্থ মর্মবাণীর মুখোমুখি করে দেবে।' না পারলেও তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে প্যাপিরাস স্বত্বাধিকারী মোতাহার হোসেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন দায়িত্ব পালন করলেন। তাকে ধন্যবাদ।

বদিউর রহমান
পরিচয়
কলেজ এভেনিউ
বরিশাল-৮২০০

অধ্যায় এক

ভূমিকা

ইসলামের (Mohammedanism) আকস্মিক উত্থান এবং নাটকীয় বিস্তৃতি মানব ইতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বর্তমান চরম সময়ে এই অধ্যায়ের আবেগহীন এবং পক্ষপাতমুক্ত অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এর অনুশীলন এমনিতেই গুরুত্বপূর্ণ। আর সাধারণ জ্ঞানানুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পড়লেও এ থেকে যে কেউ অনেক উপকৃত হতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসে ইসলামের যথার্থ ভূমিকা এবং মানব সংস্কৃতিতে এর অবদান বর্তমান ভারতের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের যথাযথভাবে জানা যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।

এদেশে এখন বহু মুসলমানের বসবাস। আমরা খুব কমই ভেবে দেখি যে, যে কোনো একক মুসলমান শাসিত দেশের চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান ভারতবর্ষে বসবাস করে। মুসলমানরা এদেশে আসার বহু শতাব্দী অতিবাহিত হলেও অনেকে এই বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীকে বহিরাগত বলেই মনে করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অদ্ভুত এবং নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যবধানের পেছনে ঐতিহাসিক কারণও আছে। মূলত মুসলমানরা এদেশে এসেছিল আক্রমণকারী হিসেবে। তারা দেশ জয় করেছে এবং শত শত বছর শাসন করেছে। বিজয়ী এবং বিজিতের সম্পর্ক আমাদের ইতিহাসে এমন প্রভাব ফেলেছে যে, আজ উভয়পক্ষই সমান বিব্রতবোধ করে। কিন্তু বর্তমান পরাধীনতার সমদুর্দশাভোগ অতীতের সেই অপ্রীতিকর সংস্কৃতিকে অনেকটা ঝাপসা করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্যে যেমন, মুসলমান জনগোষ্ঠীর জনও তা কম বেদনাদায়ক এবং ক্ষতিকর নয়। মুসলমান শাসনের দিনপঞ্জি ইতিহাসের অপরিহার্য অধ্যায় হয়ে ওঠায় ভারতীয় জাতিসত্তায় মুসলমানরা অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন। বোধকরি জাতীয়তাবাদ অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতি নিরসনে আরও এগিয়ে গিয়েছে।

বর্তমান লজ্জা থেকে সান্ত্বনা পেতে বাস্তব অথবা কল্পকাহিনীতুল্য গৌরবময় অতীত, ভারতের মুসলমান শাসকদের এক উজ্জ্বল জাতীয়তার রঙে রঞ্জিত করেছে।

তা সত্ত্বেও সম্রাট আকবরের শাসনামলের সমৃদ্ধিতে গর্বিত কিংবা সম্রাট শাহজাহানের শিল্প-সাধনার উৎকর্ষে অহংকারী হিন্দুরাও ভারত-ইতহাসের সমৃদ্ধিসৃষ্টিকারী বিশাল ব্যক্তিত্ব সেই সম্রাটদেরই ধর্ম এবং সম্প্রদায়ভুক্ত নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের থেকে আজও নিজেদের কয়েকপ্রস্ত দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। ভারতের গোঁড়া হিন্দু, জনসংখ্যার দিক দিয়ে যারা এক বিশাল অংশ, তাদের কাছে উচ্চ বংশীয়, সুশিক্ষিত এমনকি সুউচ্চ সংস্কৃতির ধারক মুসলমানরা পর্যন্ত 'ম্লেচ্ছ', অসভ্য, বর্বরই রয়ে গেল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা এদের কাছ থেকে যে সামাজিক আচরণ পায়, মুসলমানরা এর চেয়ে বেশি কিছু পেতে পারে বলে তারা মনে করে না।

এই অদ্ভুত অবস্থার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তাদের অহেতুক জাত্যাভিমানে; আক্রমণকারী বিদেশি বিজেতার প্রতি একটা বিজিত ও পীড়িত জাতির স্বাভাবিক ঘৃণার মধ্যে। যে রাজনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এর উৎপত্তি তা সুদূর অতীতের ঘটনা। তবুও সেই অভিমান এবং সংস্কারবোধ এখনও এমন প্রবল যে, তা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কেবল বাধারই সৃষ্টি করল না, বরং নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস বিচারেরও অন্তরায় হয়ে রইল। শত শত বছর ধরে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একই দেশে একই সাথে বসবাস করল, অথচ পরস্পরের সংস্কৃতি-সভ্যতা সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টাই করল না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত সত্যিই আর পাওয়া যায় না। পৃথিবীর কোনো সভ্য জাতিই হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এত অজ্ঞ নয়। ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও কেউ পোষণ করে না। আমাদের জাতীয়তার মূল বৈশিষ্ট্যই হলো আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু এই নোংরা মানসিকতা ইসলামের তুলনায় অবশ্যই অনেক বেশি স্পষ্ট। আরবের মহাপুরুষের সর্বজনস্বীকৃত বাণী ও শিক্ষা সম্বন্ধে এদের একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে। ইসলামের অসাধারণ বৈপ্লবিক গুরুত্ব ও ব্যাপক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুরই খুব সামান্য জ্ঞান আছে। এ সম্বন্ধে এদের কোনো মূল্যায়নই নেই। কোনো ক্ষতিকর পরিণতির আশংকা না থাকলে তাদের এই মনোভাবকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেয়া যেত। কিন্তু ভারতের জনগণের জাতীয় কল্যাণে এবং বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সততার স্বার্থে তাদের এই ধারণা নিরসন অপরিহার্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বর্তমান সংকটময় সময়ে ইসলামের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের সম্যক উপলব্ধি অত্যন্ত জরুরি।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন ইসলামের উত্থান ও ব্যাপ্তিকে বর্ণনা করেছেন, 'পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে যেসব বিপ্লব নতুন এবং স্থায়ী ভূমিকা রেখেছে তাদের মধ্যে অন্যতম স্মরণীয়' বলে। নতুন বিশ্বাসে বলিয়ান আরব মরুভূমির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র একটা বেদুইন দলের কাছে দুটি সুপ্রাচীন বৃহৎ সাম্রাজ্য অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে কীভাবে ধর্মান্তরিত এবং পরাজয় বরণ করল, তা ভাবলে বিস্মিতই হতে হয়। তলোয়ারের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের শান্তির বাণী প্রচারের অনন্য ভূমিকা গ্রহণের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁর অনুসারীরা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অতলান্তিক সাগরের তীর পর্যন্ত ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিল। দামেস্কের প্রথম খলিফারা এত বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন যে, দ্রুতগামী উটের সাহায্যে পাঁচ মাসেও তা অতিক্রম করা যেত না। হিজরির প্রথম শতাব্দী শেষে 'বিশ্বাসীদের নেতারা' বিশ্বের অত্যন্ত ক্ষমতাধর শাসক ছিলেন।

সকল পয়গম্বর বা নতুন মতের প্রবর্তকই কিছু অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সে হিসেবে মোহাম্মদ তাঁর আগের এবং পরের কোনো পয়গম্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। ইসলামের প্রসার, জগতের সকল অলৌকিক ঘটনার মধ্যে অলৌকিক। অগাস্টাসের রোম সাম্রাজ্য পরাক্রমশালী বীর টার্জানের সাহায্যে আরও বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল সাতশ' বছরের মহান ও মহিমান্বিত

বিজয়ের ফল। তবুও একশ' বছরের কম সময়ে আরব সাম্রাজ্য যতটা বিস্তৃত হয়েছিল, তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি। আলেকজান্ডারের রাজত্ব খলিফাদের সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশ মাত্র। পারস্য সাম্রাজ্য রোমের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রায় এক হাজার বছর টিকে থাকলেও 'আল্লাহর তলোয়ারে'র কাছে তাকে হার মানতে হয় এক দশকেরও কম সময়ে। আধুনিক কোনো ঐতিহাসিক ইসলামের এই অলৌকিক উত্থানকে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

'আরব রাষ্ট্রে, নিয়মিত সৈন্যবাহিনী কিংবা সাধারণ রাজনৈতিক অভিলাষ এর কোনো কিছুরই নামগন্ধ ছিল না। আরবরা রাজনীতিক ছিল না, ছিল কবি, স্বপ্নবিলাসী, যোদ্ধা এবং ব্যবসায়ী। ধর্মেও তারা একীকরণ কিংবা স্থিতির কিছু দেখেনি। তারা বহু ঈশ্বরের পূজায় অভ্যস্ত ছিল অত্যন্ত জঘন্যভাবে। একশ' বছর পর এই অন্ধ অসভ্যরাই পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করল। জয় করে নিল সিরিয়া ও মিশর। পদানত ও দীক্ষিত করল পারস্য। আধিপত্য বিস্তার করল পশ্চিম তুরস্ক এবং পাঞ্জাবের কতকাংশের ওপর। তারা বাইজেনটাইনস্ ও বেরবেরেসদের কাছ থেকে আফ্রিকা এবং ভিসিগোথসদের কাছ থেকে স্পেনকে ছিনিয়ে নিল। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্বে কনস্ট্যান্টিনোপলকে তারা সন্ত্রস্ত করে তুলল। আলেকজান্দ্রিয়া বা সিরিয়ার বন্দরে তাদের জাহাজ তৈরি হলো। নির্ভয়ে চলাফেরা করল ভূমধ্যসাগরে। লুট করল গ্রিক দ্বীপগুলো; আর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের নৌ-শক্তিকে। তারা এত সহজে বিজয়ী হলো যে কেবল পারস্য এবং এটলাস পার্বত্য অঞ্চলের বেরবেরেরা ছাড়া আর কেউ তেমন কোনো বাধাই দিতে পারল না। অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে সবার মনে প্রশ্ন দেখা দিল, তাদের এই বিজয়ের পথে আর কোনো বাধাই কি দেয়া যাবে না? ভূমধ্যসাগরের ওপর রোমকরা তাদের আধিপত্য হারাল। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সারা খ্রিস্ট জগৎ এক নতুন বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নতুন প্রাচ্য সভ্যতার সামনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।' (H. L. Fisher : A History of Europe : P. 137-38)

কীভাবে এমন বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা ঘটল? ঐতিহাসিকদের কাছেও এ এক বিস্ময়কর প্রশ্ন। শান্ত-সহিষ্ণু মানুষের ওপর গোঁড়ামির জয়, ইসলামের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে এই ঘৃণ্য অভিমত আজকের দুনিয়ার শিক্ষিত মানুষরা প্রত্যাখ্যান করছে। ইসলামের এই বিস্ময়কর বিজয়ের মূলে ছিল এর বৈপ্লবিক চেতনা। এবং সেই সাথে প্রাচীন সভ্যতার ঘুণেধরা কেবল গ্রিস, রোম, পারস্য ও চীন নয়, ভারতবর্ষেরও বিপুল জনগোষ্ঠীকে দুঃখ-দুর্দশার পঙ্কিলতা থেকে আলোর পথ দেখানো।

অধ্যায় দুই

ইসলামের ব্রত

ইসলামের ইতিহাসের কদর্থ ব্যাখ্যাকারীরা, হয় প্রশংসার জন্য, না হয় ইসলামের সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক গুরুত্বকে অস্বীকার করার জন্য ইসলামের সামরিক অভিযানকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান। যদি আরব মুসলমানদের নিশ্চিত দিগ্বিজয়ী সামরিক শক্তির বিজয়ই ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তাহলে তা ইতিহাসে অনন্যসাধারণ বিষয় হয়ে উঠত না। তাতার এবং সিথিয়ার (গথ, হুণ, ভ্যান্ডাল, অভর, মঙ্গোল ইত্যাদি) অসভ্যদের লুটতরাজ এবং সামরিক দুর্ধর্ষতা তাদের (ইসলামের) সমান বা বেশি না হলেও কম নয়। কিন্তু জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের মতো ইউরোপ ও এশিয়ার প্রান্ত সীমানা থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব ভূখণ্ডে (ঐ অসভ্যদের) যে প্লাবন, তার সঙ্গে আরব মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগের অনেক ফারাক। প্রথমোক্তরা (তাতার) একটা দুষ্ট গ্রহর মতো দিগ্বিদিক ধবংশ ও মৃত্যুর তাণ্ডব চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ধূমকেতুর মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। অন্যদিকে পরের শক্তি (ইসলাম) মানব-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছে। এদের অগ্রাভিযানে ধবংস ছিল কেবল একটা সম্পূরক অংশ মাত্র। নতুন নির্মাণের প্রয়োজনে এরা জরাজীর্ণ পুরাতনকে উপড়ে ফেলেছে। মানব সভ্যতার যুগযুগ সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের অসীম কল্যাণের জন্যই ধূলিসাৎ করে দিয়েছে সিজার এবং চসরুদের প্রাসাদ।

আরবীয় ঘোরসওয়ারদের বিস্ময়কর কীর্তিই ইসলামের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তাদের কথা ভাবলে অবশ্য বিস্মিত হতে হয়। এমন এক গতিশীল ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কারণ অনুসন্ধান এবং তার প্রশংসা করতে আমাদের প্রণোদিত করে। 'আল্লাহর সেনাদের' অদ্ভুত কীর্তি প্রায়ই চোখ ঝলসে দেয়। ফলে ইসলামী বিপ্লবের বৃহত্তর অর্জনের কথা ইতিহাসের সাধারণ ছাত্র, এমনকি সে মোহাম্মদের অনুসারী (মুসলমান) হলেও, তার কমই মনে থেকে। তবুও এটা সত্যি যে, আরবের নবীর অনুসারীদের সামরিক অভিযান সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক কালজয়ী সম্ভাবনার সূত্রপাত করেছিল। তারা কেবল রাজনৈতিক ঐক্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করলেও তা আর্থিক সমৃদ্ধি এবং আত্মিক অগ্রগামিতার পথ খুলে দিয়েছিল। নতুন ধ্যান-ধারণার নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষকে তাদের সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল। প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং গ্রিক পুরোহিতদের হতশ্রী পরিবেশ পারস্য ও বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের প্রজাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের পথ পুরোপুরি রুদ্ধ করে দিয়েছিল। মোহাম্মদের সুকঠোর একেশ্বরবাদ, আরবীয় মুসলমানদের

পরিচালনায় এমন ক্ষমতা দান করল যে, তা কেবল আরব উপজাতিগুলোর পৌত্তলিকতাই নষ্ট করল না; জরথুস্টের অপপ্রচার থেকে আচারভ্রষ্ট খ্রিস্টধর্মের অঘটন ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে এবং মঠ, মঠের পুরোহিত সন্ন্যাসী-সংক্রমিত কঠিন রোগের হাত থেকে অগণিত মানুষকে মুক্তি দিতে ইতিহাসের প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল। আরবদের বিস্ময়কর সামরিক সফলতা প্রমাণ করে যে, ইতিহাসের সেবা তথা মানবতার অগ্রগতির পথেই তাদের তলোয়ার চালিত হয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের করুণ পরিণতিতে বিলুপ্ত এবং খ্রিস্টীয় কুসংস্কারের মধ্যে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ধারা যখন প্রায় হারিয়ে যাচ্ছিল তখন আরবের সামরিক শক্তি এবং একেশ্বরবাদী ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো মানব সভ্যতার এই মূল্যবান অবদানকে রক্ষা এবং পুষ্ট করে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে ইউরোপকে মুক্ত করল। আর তারই সঙ্গে গড়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার গৌরবের হর্ম্য। আপাতদৃষ্টিতে ইসলামের তলোয়ার আল্লাহর নামে পরিচালিত হয়েছিল মনে হলেও আসলে তা এমন এক নতুন সমাজ গঠন এবং চিন্তাধারার পথকে উন্মুক্ত করেছিল, যা কার্যত অন্যসব ধর্ম এবং বিশ্বাসের কবর দিয়েছিল।

সুস্পষ্টভাবে এবং আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে ধর্মের চেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নিয়েই ইসলামের উত্থান। এর ইতিহাসের গোড়ার দিকে শুনতে পাই আরব মরুভূমির বিভিন্ন বেদুইন গোত্রের এক হবার জরুরি আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়া আসে খুব দ্রুত। এরপরই রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এশিয়া ও আফ্রিকার প্রদেশগুলো প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেঁচে ওঠার জন্য একসাথে এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় একেশ্বরবাদীর পতাকাতলে মাথা গুঁজে দাঁড়াচ্ছে। আগের সব বিপ্লব আপনাআপনি আদর্শচ্যুত হলো। একদিকে সামাজিক বিলুপ্তি (সন্নাসবাদ) অন্যদিকে কেবল বিলীয়মান সাম্রাজ্যের অবলম্বন হয়ে পড়ায় খ্রিস্টধর্ম তার মূল বিপ্লবী শক্তি হারিয়ে ফেলল। খৃস্টধর্মের বিচ্যুতির সাথে সাথে চলমান সামাজিক সংকট আরও বেড়ে গেল। ক্ষয়িষ্ণু রোমান জগতের দূষিত পরিবেশ থেকে দূরে থেকে সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য ফেঁপে ওঠা আরব বণিক-যাত্রীদলের কাছ থেকেই এল মুক্তি এবং আশ্বাসের শুভবার্তা। 'ইসলামী বিপ্লব' মানবতাকে বাঁচিয়ে দিল।

ইসলামের ইতিহাসের এক প্রখ্যাত লেখক মোহাম্মদের অভিযাত্রা সম্বন্ধে লিখেছেন : 'তিনি দেখালেন একটা সমগ্র জাতি জ্ঞান ও ক্ষমতার উন্নতির পথে স্রোতের মতো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আরব জনগণের যে জীবন্ত প্রাণস্পন্দন মোহাম্মদের ব্রত সাধনে সহায়তা করেছিল, তা-ই তাঁর জীবদ্দশায় আরও বহু মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়েছে।' (Okley : History of the Saracens)।

ইসলামের ইতিহাস পড়ে যারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এক ধর্মান্ধ ভীতসন্ত্রস্ত যাযাবর জাতিকে ভয়াবহ ও ভীতিকর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনির মধ্যে, হয় কোরআন না হয় তলোয়ারের যে কোনো একটা বেছে নেয়ার হুঙ্কার দিয়ে ছুটে বেরিয়েছে, হয় তারা এর মর্ম বোঝেনি, না হয় বুঝতে চায়নি। কারণ হিসেবে বলা যায় যদিও কেবলমাত্র মোহাম্মদের অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকাররা ইহলৌকিক এবং ধর্মমূলক বিজয়ের মধ্যে নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তবুও চরিত্রের মাহাত্ম্যে, উদ্দেশ্যের সততায় এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী অ্যালারিক, অ্যাটিলা, জেনসেরিক, চেঙ্গিস, তৈমুরলং প্রমুখ বর্বরদের থেকে এদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। অন্ধ বিশ্বাসে তাদের ধার্মিকতা বলীয়ান হলেও কপটতার স্পর্শে তা কলঙ্কিত হয়নি। হৃদয়ের ঔদার্য এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রখরতায় তাদের ধর্মাবেগ ছিল গভীর মাধুর্যময়। তাদের প্রত্যাশা ছিল স্বার্থান্ধতা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্ত। তাদের আল্লাহভক্তির পেছনে লোভ-লালসার কোনো ছদ্মাবরণ ছিল না।

প্রথম খলিফা আবু বকরের মতো স্বচ্ছ, ধর্মপ্রাণ, বিশ্বস্ত এবং বিনয়ী নিরহংকার চরিত্র ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। 'আল্লাহর সেনা'-দের প্রতি তাঁর নসিহত : 'ন্যায়পরায়ণ হও, অন্যায় আচরণকারীরা কখনও উন্নতি করতে পারে না। সাহসী হও, মৃত্যুবরণ করবে তবু আত্মসমর্পণ করবে না। সদয় হও, নারী-বৃদ্ধ, শিশুদের গায়ে হাত তুলবে না। ফলের গাছ কিংবা পশু কোনো কিছুই নষ্ট করবে না। শত্রুকে কথা দিয়েও তার বরখেলাপ করবে না। আশ্রমবাসীদের প্রতিও রূঢ় হবে না।' দেখা গেছে প্রবীণ খলিফার অনুসারী ভক্তরা তার এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

বাইজেনটাইন দুঃশাসকের দুর্নীতিতে নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত; পারস্যের স্বেচ্ছাচারিতা আর খ্রিস্টীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সকল মানুষ মুসলমানদের বরণ করে নিল মুক্তিদাতা হিসেবে। নবীর বিপ্লবী শিক্ষায় একান্ত বিশ্বাসী এবং খলিফার সময়োপযোগী কার্যকর উপদেশে নির্ভরশীল এই মুসলমানরা খুব সহজেই বিজিত জাতির সহানুভূতি লাভ করতে পেরেছে। কোনো বিজিত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় সমর্থন কিংবা নীরব সহনশীলতা ছাড়া কোনো বিজয়ী জাতি নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

দ্বিতীয় খলিফা ওমরের দুর্মদ অশ্বারোহী বাহিনীর বিজয় অভিযান পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে একদিকে ওজাক্স নদীর সুদূর তীর এবং অন্যদিকে রোমান জগতের দ্বিতীয় মহানগর আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে অবাধ গতিতে অগ্রসর হয়ে পথ সহজ করে দিলে তিনি উটে চড়ে জেরুজালেম প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে উটের পিঠেই ছিল রাজকীয় সব খাবার-দাবার আর সাজসজ্জা। আর ছিল মোটা পশমের তৈরি একটি তাঁবু, এক বস্তা গম, এক বস্তা খেজুর, একটা কাঠের পেয়ালা, একটা

চামড়ার পানিপাত্র। মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, জেরুজালেম এবং মিশর বিজেতার অনাড়ম্বরতা, ধর্মনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন : 'পথে যেখানে তিনি থামতেন, কোনো ভেদাভেদ না করে সবাইকে ডেকে নিতেন তাঁর সাদামাটা খাবার খেতে। সে সময়টুকু তিনি প্রার্থনা (নামাজ) এবং নানা সৎ কাজের উপদেশ দিয়ে উৎসর্গ করতেন। আবার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে (যুদ্ধ) যাত্রা কিংবা তীর্থযাত্রা (হজ)-র সময়ও তার অসাধারণ ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পেত। তিনি বহু বিবাহ এবং আরবে প্রচলিত বহুবিবাহের উচ্ছৃঙ্খলতার সংস্কার করলেন। করদাতাদের মুক্ত করলেন নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা থেকে। মূল্যবান রেশমি বস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে, আরবদের তিরস্কার করলেন তাদের বিলাসিতার জন্যে এবং সেই সাথে তাদের মুখে দিলেন চুনকালি মেখে।' (Decline and Fair of the Roman Empire)

খালেদ, মোহাম্মদ যাকে 'আল্লাহর তলোয়ার' বলতেন, যার প্রবাদতুল্য বীরত্বের জন্যই আরব, মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়া ইসলামের পতাকাতলে এসেছিল, মৃত্যুর পর তার নিজের ঘোড়া, অস্ত্র এবং একজনমাত্র চাকর ছাড়া আর কিছু তিনি রেখে যাননি। যৌবনে এই বীর পুরুষ মাথা উঁচু করে বলতেন : 'সিরিয়ার বিশাল সম্পদের পাহাড় কিংবা দুনিয়ার অন্য কোনো আনন্দের লোভে ধর্মের নামে আমার জীবন উৎসর্গ করিনি, আমি যা করেছি তা আল্লাহ এবং তার রসূলের অনুগ্রহ পাবার জন্যই করেছি। (ঐতিহাসিক আবু ফেদা-র লেখা থেকে)

মিশর বিজেতা ওমর ছিলেন একাধারে বীর যোদ্ধা এবং প্রতিভাবান কবি। খলিফা ওমরের কাছে পাঠানো তার প্রতিবেদনের এই অংশটুকু বেশ উল্লেখযোগ্য : 'অগণিত কৃষক, যারা জমিকে কালো করে তোলে, তাদের তুলনা করা যেতে পারে কেবল পরিশ্রমী পিঁপড়ের দলের সঙ্গে। মহাজনের চাবুকের ঘায়ে তাদের সহজাত আলস্য ছুটে যায়। কিন্তু যে সম্পদ তারা উৎপাদন করে শ্রমিক মালিকদের মধ্যে তার অসম বন্টন হয়।' সময়ের বিচারে এ ছিল এক অগ্রগামী ভাবনা। প্রাচীন সভ্যতায় সামাজিক সাম্য ছিল একেবারেই অপরিচিত একটি বিষয়। শ্রমজীবী মানুষ, ক্রীতদাস কিংবা শূদ্র, সকলকেই আইনত প্রচুর প্ররিশ্রম করতে হতো; তারপরও তারা ছিল ঘৃণা এবং কৃপার পাত্র। তাদের মানুষ বলেই ভাবা হতো না। মূলত আরব ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রথম খলিফা যে অর্থনৈতিক অনুশাসন জারি করলেন, তাতেই সমাজের প্রাচীন ধারায় এল আমূল পবির্তন। শ্রমিকদের উৎপাদিত সম্পদের কিছুটা অংশ তাদের কাছে থাকলে ব্যবসায় বেশ সুবিধা হয়। ফারাও এবং টলেমিদের বিজিত রাজ্য শাসনামলে যে দুঃসহ অন্যায় এবং বৈষম্য তার কবি মনকে স্পর্শ করেছিল, এই আরব সেনাপতি তা সহজেই দূর করতে পেরেছিলেন। গ্রিক ও রোমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাসন-শোষণ করে যে মিশরকে নিঃসাড় করে দিয়েছিল, আরব শাসনামলে তা আবার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল।

তাদের ইতিহাসে এমনকি যুদ্ধকালীন আরব মুসলমানরা যে ধর্মের নামে অসভ্য বর্বরদের মতো খুন-খারাবি ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়নি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাদের রাজ্যাভিযানের সময় ছিল সীমিত। সে তুলনায় খলিফাদেরও স্বাধীন রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের সময় ছিল অনেক বেশি। নবীর মদিনায় আগমনের একশ' বছর পর আব্বাসীয় খলিফাদের দ্বারা 'শান্তি নগরী' বাগদাদ প্রতিষ্ঠা হতে না হতেই তাদের সামরিক অভিযানের সময় প্রায় শেষ। এরপর আরবরা মাঝেমধ্যে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে, তা করেছে আত্মরক্ষা এবং সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

সময় এবং সাফল্যই আরব যোদ্ধাদের অনমনীয় উদ্দীপনাকে শান্ত করেছিল। তারা ধন-সম্পদের মালিক হতে শুরু করল ব্যবসা-বাণিজ্য করে, যুদ্ধ করে নয়। যশ-খ্যাতির প্রত্যাশী হলো বিজ্ঞান ও সাহিত্য সাধনায়। কেবল আল্লাহ রসূলের আরাধনায় নয়, তারা সুখ চাইল শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-যাপনের মাধ্যমে। আরবরা আর যুদ্ধকে জীবনের একমাত্র বৃত্তি এবং গর্বের ব্যবসা হিসেবে দেখল না। কারণ তাদের পূর্বপুরুষদের দক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ জীবনের আনন্দ দেখে তারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। আবু বকর এবং ওমরের নেতৃত্বে যুদ্ধের পতাকাতলে সমবেত হওয়াই নির্ভীক বীরদের জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড ছিল, তাদের উত্তরপুরুষরা সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে জীবনকে আরও উন্নত দেখল। তারা দেখল, বিজ্ঞান ও দর্শন আরও আকর্ষণীয়।

তিনশ' বছর শান্তি, সমৃদ্ধি ও সমুন্নতিতে কাটানোর পর খ্রিস্টানদের প্রতারণামূলক ধর্মযুদ্ধের নামে আক্রমণ ঠেকাতেই আরব সামরিক শক্তি আবার জ্বলে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ার বর্বর মঙ্গোলরা আরব শক্তিকে পরাভূত করার পরই কেবল মুসলিম বিজয়াভিযানের সঙ্গে লুট, স্বৈরাচার, উৎপীড়ন ইত্যাদি দেখা গেল। রাজপ্রাসাদ এবং কোর্ট-কাছারির শোভা বৃদ্ধির দিকে নজর পড়ায় আরবের সাংস্কৃতিক দিকটা অবহেলিত হতে লাগল। আর ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শবাদ ক্রমশ তার মূল জৌলুস হারিয়ে হিংস্র তুর্ক ও তাতারদের হাতে পড়ে কালিমালিপ্ত হয়ে উঠল।

ইসলামকে কেবল সামরিক শক্তি হিসেবে দেখলে তা হবে ইতিহাসের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় অন্যায়। মোহাম্মদ শুধু আরব যোদ্ধাদেরই নয়, আরব বণিকদেরও নবী ছিলেন। যে নাম দিয়ে তিনি তার মতাদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন তার সাথে আজকের ধারণা অনেক দূরে এবং বিরোধী। ইসলাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি স্থাপন করা অথবা শান্তি আনয়ন করা। আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপন করে তার একত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে মাটির পুতুল, মূর্তি কিংবা দেবদেবীর প্রতি মানুষের ভক্তি উপাসনা বন্ধ করে এবং আরবের বিবদমান বিভিন্ন উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল অত্যন্ত জরুরি। আরব বণিকদের জন্য তা ছিল

অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ব্যবসায় উন্নতি বা সমৃদ্ধি সহজ। জীর্ণপ্রায় রাষ্ট্র এবং নিষ্প্রাণ ধর্মবিশ্বাস এমনভাবে চিরস্থায়ী যুদ্ধ ও বিদ্রোহের বীজ বপন করে চলেছিল যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এদের ধবংস ছিল অপরিহার্য। মোহাম্মদের ধর্মবিশ্বাস আরব মুলুককে গৃহবিবাদ থেকে রক্ষা করে শান্তি দিল। আর আরব সৈন্যদের দুর্জয় রণশক্তি সমরখন্দ থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার অধিবাসীদের জন্য শান্তির আশীর্বাদ বয়ে আনল।

কোনো দেশ আরবদের অধীনে আসা মাত্র সে দেশের কৃষি এবং ব্যবসার উন্নতিতে অর্থনৈতিক জীবন চাঙ্গা হয়ে উতে। ইসলামী রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারিত ও নির্দেশিত হতো আরব ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের গতি এবং স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে। রোমান কিংবা প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী দেশের শাসকরা যে কোনো লাভজনক পরিশ্রমকে ঘৃণা করত। ব্যবসা-বাণিজ্যকে দেখত নীচু চোখে। যুদ্ধ এবং পূজা-উপাসনা ছিল তাদের আদর্শ বৃত্তি। আরবরা ছিল অন্যরকম। যাযাবর মরুজীবন তাদের শিখিয়েছিল পরিশ্রমই স্বাধীনতার মূল। তাদের কাছে ব্যবসাই স্বাধীন মানুষের জীবিকা অর্জনের লাভজনক এবং আকর্ষণীয় পেশা। এমনিভাবে পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সামাজিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠল। ধর্ম শ্রমের জয়গান করল, প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথকে সুগম করে দিল। রাজ্য শাসন, যুদ্ধ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার মতোই বাণিজ্য ছিল স্বাধীন এবং মহৎ বৃত্তি। বাগদাদের খলিফারা শুধু বড় ব্যবসায়ীই ছিলেন না, তাঁদের প্রথমদিকের অনেকেই শিল্পকাজ শিখতেন আর নিজের পরিশ্রমের পয়সায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য শিল্পকর্মের চর্চা করতেন। অধিকাংশ আরব দার্শনিক ও পণ্ডিতের জন্ম ব্যবসায়ী পরিবারের। বোখারা ও সমরখন্দের বদান্যতা এবং আন্দালুশিয়ার সুলতানের জৌলুস এসব কোনো কিছুই জোর করে খাজনা বা কর নিয়ে বেড়ে ওঠেনি; এসব সম্ভব হয়েছিল অনুকূল বাণিজ্যিক পরিবেশের জন্যই।

কোনো কোনো পরিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্য আধ্যাত্মিক বিপ্লবের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আরব বণিকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা মোহাম্মদের একেশ্বরবাদের সৃষ্টি করেছিল যা আক্ষরিক অর্থে এক যাযাবর মরু জাতিকে ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ এবং বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। কোরআনের আইন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বিপ্লব সাধন করল। সেই বিপ্লবের ফলে উৎপাদন বাড়ল, যা এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির নতুন যুগের সূচনা করল। ব্যবসা-বাণিজ্য মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। দূর দেশের মানুষ, সেখানকার বিচিত্র রীতি-নীতি দেখে একজন ব্যবসায়ী বিভিন্ন জাতির নানা মানুষের সংস্পর্শে এসে নিজের সমাজের স্থানীয় সংস্কার ও সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠে। সে অপরের আচার-ব্যবহার, মত এবং ধর্মবিশ্বাস বুঝবার জন্য নিজের সহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতি

বাড়িয়ে তোলে। দেশ দেখার আকাঙ্ক্ষা এবং কৌতূহল তাকে অজানা সমুদ্রযাত্রায় কিংবা ভিনদেশে পাড়ি জমাতে আগ্রহী করে তোলে। ফলে তার বিশ্বাসপ্রবণতা কমে যায়, সমালোচনার শক্তি তার সামনে জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। জীবিকার মূলধারা একজন ব্যবসায়ীকে বিমূর্ত ভাবনার শক্তি জোগায়। এভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রতি তার আগ্রহ থাকে না। লাভের আশায় তার মন ব্যস্ত থাকে। পশম, আটা, না মশলা, তার উট বা জাহাজ কী দিয়ে বোঝাই হবে, তা সে থোড়াই কেয়ার করে। তার ব্যবসায়ে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য নয়; এমন কিছুর ওপর তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যেগুলো শুধু তার উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়। পণ্য কেনাবেচা করে তা থেকে মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়া। সে মালামাল যাচাই করে, কিন্তু তা তার গুণগতমান বিচারের জন্য নয়, শুধু বাণিজ্যে লাভালাভের দৃষ্টিতে।

মানুষের সব অদ্ভুত আচরণ সহ্য করার ক্ষমতা, বুঝবার আন্তরিক চেষ্টা, সংস্কারমুক্ত মন, নিরক্ষর নৈপুণ্য এবং নিরাসক্ত চিন্তা করার সামর্থ্য; ব্যবসাবৃত্তির এসব অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা করে। অলৌকিকতার মোহে আচ্ছন্ন, নানা সংস্কারে বিশ্বাসী, অবাস্তব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিরন্তন সত্যের মর্যাদা দিয়ে সেগুলোকেই দেখতে অভ্যস্ত; নানা জায়গায় এরকম বিভিন্ন মানুষ দেখে-শুনে সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী বহু অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ একজন ব্যবসায়ী এদের সহজ বিশ্বাসের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকায়। তাদের অজ্ঞতার জন্য দুঃখও অনুভব করে আবার ধর্মের নানা মত এবং উপাসনার নানা আচারের মধ্যে তাদের যে একটা সরল বিশ্বাসী মন তা দেখে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় তার মন ভরে ওঠে।

যেসব দেশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরব সাম্রাজ্যের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, তাদের ওপর দিয়েই চলেছিল মধ্যযুগের আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রধান পথগুলো। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য উত্তর দিকের পথ কনস্টানটিনোপোলের মধ্য দিয়ে ইতালি ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে পৌঁছেছিল। কিন্তু বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের রাজস্বজনিত হিংসাত্মক আইন আর সিরিয়ার বর্বরদের অতর্কিত হামলা সেই পথকে বিপজ্জনক করে তুলেছিল। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য এবং ওক্‌সারের তীরবর্তী অন্যান্য এলাকা জয় করার পর আরবরা দখল করে নিল চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য। সেই সাথে তাদের নিজেদের রাজ্য আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বাজারের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একদিকে ভারতবর্ষ ও চীনের সাথে এবং অন্যদিকে ইউরোপের সাথে প্রায় সব বাণিজ্যই করেছে আরবরা। হাজার হাজার বাণিজ্য যাত্রীদল মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চীন এবং ভারতবর্ষের সুদূর প্রান্তসীমা থেকে স্পেন এবং মরক্কো পর্যন্ত পথ হেঁটেছে। একমাত্র গ্রিক ছাড়া প্রাচীন সভ্যতার অন্যান্য এলাকায় বাণিজ্য যাত্রীদের যে নির্যাতন এবং উপদ্রব সহ্য করতে হতো,

আরবদের তেমন কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। এরাই ছিল আরব সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণীভুক্ত।

আরব সাম্রাজ্যের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পথ এমন আশ্চর্যজনকভাবে খুলে গেল যে, তা আরবদের জাতীয় উদারতা, দুনিয়ার মানুষকে আপন করে দেখার সুবুদ্ধি আর সব কিছুকে বিচার-বিবেচনা করে দেখার পরিচয়বাহী সামরিক অভিজাততন্ত্র এবং উগ্র ধর্মত্ববাদের নেতৃত্বে মানুষের আদর্শবাদ অস্পষ্ট রহস্যবাদ থেকে অন্ধ বিশ্বাসে রূপ নেয়। বিশ্ব রহস্যের বিশ্লেষণ প্রয়াসী দর্শনশাস্ত্র তাই প্রথম দেখা যায় সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী-শাসিত সমাজে। সে কারণে গ্রিসের মহানগরগুলোই দর্শনের জন্মস্থান।

ইতিহাসের এক অপরিহার্য সৃষ্টি ইসলাম; মানব সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক। এর আদর্শ গড়ে উঠল নতুন সমাজ-সম্বন্ধের বাণী নিয়ে, যার ফলে মানব মনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু ইসলাম যেমন প্রাচীন সভ্যতার জীর্ণদশাকে ধবংস করে সেখানে নিজের অবস্থান করে নিয়েছিল, তেমনি কালক্রমে উন্নততর সমাজব্যবস্থা তাকেও ছাড়িয়ে গেল। পরবর্তীকালে ইসলাম তার আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তুলে দেয় নবতর প্রতিবেশে গড়ে ওঠা নতুনদেরই হাতে। কিন্তু তা ভবিষ্যৎ সমাজ বিপ্লবে সহায়তাকারী আদর্শবাদী বিষয়াদির (Instrument) গতিকে যথাযথ পথ চলার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই পথ ছিল ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী দর্শন। ইসলামের সংস্কৃতিই নতুন সমাজবিপ্লবের ধারা বিকাশের কৃতিত্বের দাবিদার।

মধ্যযুগের বর্বরতার বিশৃঙ্খলতা থেকে ইউরোপকে মুক্তি দিল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি। যুক্তিবাদী দর্শনের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার অস্ত্রকে শাণিত করে খ্রিস্টীয় মতবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চের আধ্যাত্মিক একাধিপত্যকে পরাজিত করল। গ্রিসের প্রাচীন পণ্ডিতদের সৃষ্ট এই অস্ত্র, বর্তমান (আধুনিক) সভ্যতার প্রতিষ্ঠা পেল আরব পণ্ডিতদের কাছ থেকেই। আরব পণ্ডিতরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সম্পদ কেবল রক্ষাই করেনি, একে সমৃদ্ধিশালীও করেছে। আরব মরুভূমির যাযাবররা ইসলামের পতাকাতলে যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ শুরু করেছিল তা ধাপে ধাপে হাজার বছর ধরে তিন মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা পার হয়ে অবশেষে ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের ইহজাগতিক ভাবনা এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগ্রামে জয়ী হলো।

অধ্যায় তিন

ইসলামের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি

অন্যান্য ধর্মের উৎপত্তি যেমন কোনো ধর্মের প্রবর্তকের একার কৃতিত্ব নয়, শান্তির ধর্ম ইসলামও তেমনি মোহাম্মদের একক সৃষ্টি নয়। কোনো ধর্মই কোনো ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়। কোনো ধর্ম হঠাৎ আবির্ভূত হয় না। অথচ সকল ধর্ম সম্বন্ধেই এমন দাবি করা হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মের মতো যে সময় বা পরিবেশে ইসলাম পরিপুষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে, তা সেই সময়ের অবশ্যম্ভাবী ফসল।

দিগন্ত বিস্তৃত আরব উপদ্বীপের কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশ যেভাবে তার অধিবাসীদের জীবন গড়ে তুলেছে, তারই জন্য তারা আসিরীয়, পারস্য, মিশর এবং রোমের উল্লসিত সৈনিকদের যাতায়াতের বিপদ সঙ্কুল পথের পাশে বসবাস করেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছিল। কিন্তু প্রবল স্বাধীনতাপ্রীতি সেই সাথে যাযাবর জীবনের অত্যাবশ্যক ধারা আরব মরুবাসীকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছিল। এদের ছিল অন্তহীন যুদ্ধ-সংঘাতের ধারা।

ব্যাপক মানবগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে আরবরা বিদেশি আগন্তুক মাত্রকেই শত্রু ভাবত। নিজের দেশের দৈন্য এই মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। এই দুটি বিষয়ই আরবদের আইন-কানুন এবং নৈতিক অনুশাসন গড়ে তুলেছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল ইসলামের পরিত্যক্ত বংশধর হিসেবে অনুর্বর মরুভূমিতেই তাদের বসবাস করতে হবে। অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ বসবাস করবে উর্বর এবং ফলনশীল ভূখণ্ডে। ফলে তারা যে যেখানে যা পেত তাই জোর করে নিয়ে মনে করত, তাদের ন্যায্য প্রাপ্যের কিছুটা হলেও উদ্ধার করতে পেরেছে।

রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি মোহাম্মদের আবির্ভাবের ছয়শ' বছর আগের আরবদের কথা লিখতে গিয়ে লেখেন, তাদের দেশে স্বাভাবিক মেঘ ও অশ্ব প্রতিপালন ছাড়া লাভজনক কাজ ছিল দুটি, দস্যুতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য। সমাজ বিবর্তনের আদি পর্বে এই দুই জীবিকা দস্যুতা এবং বাণিজ্যের মধ্যে তফাৎ ছিল খুবই ক্ষীণ এবং সামান্য।

'ব্যবসায়ী যথাসম্ভব কম দামে জিনিস কিনে লাভ করার জন্য সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে। যত কম দামে সে কিনতে পারবে, তার লাভ ততই বেশি। দস্যুতা বা চুরি করে আরও কম দামে ব্যবসায়ী জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারে। ব্যবসার মূলনীতিকে স্বীকার করলে ব্যবসায়ীর সবচেয়ে বেশি লাভ করার আইনগত অধিকারও আমাদের মানতে হয়। তাহলে প্রতিযোগিতা থাকলে জিনিসপত্রের দাম কম থাকে। প্রতিযোগিতা দূর করতে হলে প্রতিযোগীকে কজা করতে হয়। এই কৌশলে প্রতিযোগী যে শুধু বাজার থেকে সরে যায় তাই নয়, তার মালামাল বাজারে

ওঠে যোগ্য লোকের হাত দিয়ে। এছাড়া দস্যুতা বাণিজ্যপথ এবং বাজারে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার এক মারাত্মক অস্ত্র। বাণিজ্য বিকাশের প্রথম দিকে প্রায় সব জায়গায় এক ধরনের বাস্তব নীতি অনুসরণ করা হতো, যা আধুনিক ব্যবসায়ীকে কষ্টই দেবে। তবুও তাদের পূর্ববর্তীরা অপেক্ষাকৃত অকপট দস্যুতায় যে মহৎ পেশার প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, আজকের দিনের ব্যবসায়ীরা 'সাধুতাই উত্তম পথ' এই বহু প্রশংসিত নীতিবাক্যের আবরণে মূলত তারই জের টেনে চলেছে।

এছাড়া দস্যুতা নীরবে মানুষকে এক রাজনৈতিক গুণসম্পন্ন সামরিক চেতনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় যা আদিম মানব জাতিকে পৌঁছে দেয় উত্তরণের সন্ধিলগ্নে। মাতৃভূমির এই প্রাকৃতিক পরিবেশে আরবরা ব্যবসায় এবং যুদ্ধে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। তাদের সাহসিকতা এবং যুদ্ধপ্রীতির কাহিনী ছিল প্রায় রূপকথার মতো। আরব সাম্রাজ্য বিকাশের চরম সময় রচিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আয়াম আল আরব' (আরবের সময়)-এ নবীর আগমনের আগে আরবদের অন্তত সতেরশ' উল্লেখযোগ্য যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং আরব মুসলমানরা যে নিজেদের যোদ্ধা বলে দাবি করে তা ইসলামী বিশ্বাস থেকে পাওয়া নয়। আল্লাহর নামে অসি চালানোর অনেক আগে থেকেই তারা যোদ্ধা ছিল। ইসলামের সামরিক বিজয় যতটা না আরবীয় নবীর ধর্মীয় শিক্ষার ফল, তারচেয়ে অনেক বেশি যে দেশে এর জন্ম সেই দেশের সামাজিক পরিবেশ।

নবীর আবির্ভাবের আগে আরবরা যত যুদ্ধ করেছে তা ছিল পরস্পর রক্তক্ষয়ী হিংস্রতা এবং ভীষণতায় পূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেসব যুদ্ধের মধ্যেও এক অদ্ভুত সম্মানজনক বীরত্ব, নীতিবোধ এবং মহত্ত্বের রীতি প্রচলিত ছিল। ব্যাপক রক্তপাত আরবের বালুরাশিকে উর্বর করেনি, কিন্তু আদিম আরব জাতির ন্যায্য ব্যবসায় দস্যুবৃত্তির লাভজনক অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এতকাল যুদ্ধের নামে যে গৌরব তারা বোধ করেছে এবং যে মারাত্মক ও কঠিন যুদ্ধ তারা করেছে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই তার পরিসমাপ্তি দাবি করল। সেই সাথে যুগ যুগ ধরে চলমান আরব-শৌর্যকে আরও লাভের পথে মুখ ফেরাতে বাধ্য করল। সেই প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির দাবিই ক্রমে 'মোহাম্মদের ধর্মে' পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করল।'

এক বিশাল মরুদেশ আরব। কিন্তু এর তিন দিক প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান জনবহুল উর্বরদেশ বেষ্টিত, যেখানে কৃষি-বাণিজ্যের বিকাশ স্মরণাতীতকাল থেকেই বিদ্যমান। দক্ষিণের সাগর দিয়ে ভারতীয় পণ্যের জাহাজ চলাচল করে। এর ভৌগোলিক অবস্থানকে ধন্যবাদ। এজন্যই আরবরা ভারত, পারস্য, আসিরিয়া, সিরিয়া, জেরুজালেম, মিশর এবং আবিসিনিয়ার মধ্যে নৌ কিংবা স্থলপথে মনোযোগের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পেরেছে। প্রথম দিকে বিস্তীর্ণ বালু-ভূমির অপরিচিত গণ্ডি অতিক্রমের সাহস না দেখিয়ে তারা আফ্রিকা ও এশিয়ার বাণিজ্যপথ

করেছিল স্পেন ও পর্তুগিজের দক্ষিণ-উত্তর দিয়ে। কিন্তু বাইজেনটাইনের অত্যধিক করভার এবং স্থানীয় কর্মচারীদের সীমাহীন দৌরাত্ম্য, পরের দিকে হিংস্র অথচ অতিথিপরায়ণ বেদুইনদের সকল বিপদ মেনে নিয়ে তাদের দেশের মধ্য দিয়েই ব্যবসায়ীরা পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

শুরুতে আরবরা তাদের অদ্ভুত আইন এবং নৈতিক বোধ অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে রাজ্য-কর আদায় করেছে। কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করল, পরের জিনিস লুট করার চেয়ে ব্যবসা অনেক লাভজনক। অন্যান্য গোত্রের মধ্যে কোরায়েশরাই সবার আগে হিংস্রতার পরিবর্তে জীবিকার জন্য শান্তিপূর্ণ অথচ অধিক লাভজনক বৃত্তি গ্রহণ করল। তারা বসবাস শুরু করে লোহিত সাগরের তীরে এবং এশিয়ার বাণিজ্য-পথ সেদিকে আসার আগেই তারা আবিসিনিয়ার ব্যবসা দখল করে নেয়। খ্রিস্টযুগের গোড়ার দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তর এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমের প্রধান বাণিজ্যপথগুলো এসে মিশে কোরায়েশদের রাজধানী মক্কা নগরীতে। আরব সাগরের উপর ইয়েমেনে কোরায়েশ বাণিজ্য-যাত্রীরা ভারত থেকে মালামাল ক্রয় করেছে। তাদের মালামালের বোঝা আরও বাড়িয়ে তুলেছে আধুনিক এডেনের কাছাকাছি কোনো জায়গায় আবিসিনিয়া থেকে আনা আফ্রিকার সম্পদে। তাদের উত্তর দিকের বাণিজ্য-যাত্রা শেষ হয়েছে দামেস্কের জনবহুল বাজারে এসে; যেখান থেকে তারা আরব সুগন্ধি, মণিমুক্তা, মূল্যবান পাথর আর হাতির দাঁত ইত্যাদির বদলে কিনেছে খাদ্যশস্য এবং নানান তৈরি জিনিসপত্র। এই আকর্ষণীয় বিনিময় ব্যাপকতা লাভ করে এবং মক্কার পথে-প্রান্তরে বিপুল ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করে। পরে যখন পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যপথও মক্কার ভেতর দিয়ে গেল তখন কোরায়েশরা আরও সমৃদ্ধিশালী হয় এবং সেইসাথে তাল মিলিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে যায়।

কোরায়েশদের এই স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধিতে অন্যান্য আরবীয় গোত্র ঈর্ষান্বিত হলো এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী নৈতিক এবং আইনগত নিয়মনীতি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, যা ইহজাগতিক মূল সূত্র আর ধোপে টেকে না। নিজ নিজ গোত্র-দেবতার বলে বলীয়ান হয়ে তারা আক্রমণাত্মক এবং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের আভিজাত্যে জেগে উঠল। অসতর্ক বিদেশিদের প্রাণের মূল্যে তাদের প্রাচীন জাতীয় পেশা দস্যুতার প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত নতুন জাতীয়বৃত্তি ব্যবসার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল। তখন যারা অর্থনৈতিক শক্তির ওপর কর্তৃত্ব করে ইতিহাসের গতিকে একটা আদর্শের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় পরস্পর বিবাদরত বিভিন্ন গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা গুরুদায়িত্ব পড়ল তাদেরই ওপর। এ কাজে কোরায়েশরাই ইতিহাসের পছন্দের হিসেবে গৃহীত হলো।

নিরন্তর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত থেকেও আরবের সকল গোত্র মক্কার কাবা মন্দিরে যথারীতি উপাসনা উৎসর্গ করত। জাতীয় উপাসনালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল কোরায়েশদের ওপর এবং গোত্রের প্রধান পরিবার হাশেমিরাই পৌরহিত্য করার

অধিকারী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হাশেমিরা একারণে জাতীয় সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিল। এদেরই এক সুযোগ্য বংশধর 'এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই' ধর্মের এক নতুন ধারণার মধ্য দিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানালেন।

মোহাম্মদের পবিত্র একেশ্বরবাদ কেবল আত্মকলহরত বিক্ষিপ্ত মানুষদের এক হবার বিনীত আহ্বানে প্রতিধ্বনিই করেনি, বরং ক্যাথলিক চার্চের অত্যাচারপীড়িত পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোর কাছ থেকেও ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের যোগতত্ত্ব এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের গোঁড়ামি পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশরের জনগণের ধর্ম-জীবন দুর্ভাগ্যজনকভাবে জটিল করে তুলেছিল। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান এবং যাগ-যজ্ঞই দখল করে নিয়েছিল ধর্মের সকল স্থান। সেখানে ভক্তি অনুরক্তির লেশমাত্র ছিল না, ছিল কেবল আড়ম্বরতা আর আস্ফালন। যুক্তিহীন গোঁড়া ধর্মীয় উত্তেজনার চাপে বিশ্বাস গেল উবে। আর দেবদূত, সাধুসন্ন্যাসী ও পীর-পয়গম্বরদের বিভ্রান্তিকর অস্বাভাবিক ভিড়ে ঈশ্বরও ছিলেন পালিয়ে। নতুন ধর্মের কঠিন ও কঠোর সত্য, 'আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়', আর এই ধর্মের মূল নীতি পরমতসহিষ্ণুতা সহজ-সরল অথচ সর্বদা বিবদমান, মূঢ়, জীর্ণপ্রায় অসহায় মানব সমাজকে আলোর সন্ধান দিল। আর তারাও এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল এই ধর্মকে। পাশের দেশগুলো যখন বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদের চাপে কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে নিষ্ক্রিয় এবং প্রায় নিঃশেষ হচ্ছিল, তখনই অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনায় উজ্জীবিত বাণিজ্যযাত্রী আরবদের দ্বারাই ইতিহাসের এই আহ্বান জানানো সম্ভব হলো। একেশ্বরবাদরূপে ভীষণ কঠোর এই মতবাদের প্রচার সামরিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা করল আর তাই কিছুদিনের মধ্যেই সমাজজীবনের ধর্ম, বিচার-আচার, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই একটা অবিচ্ছেদ্য রূপ ধারণ করল। আরবদের এই একেশ্বরবাদ প্রাচীন সভ্যতার ধবংসাবশেষ থেকে নতুন সমাজ গঠনের ভিত পত্তন করল। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর বিদ্বেষ জর্জরিত অগণিত মানুষ এই ধর্মমতের সরল ও অনাড়ম্বর রূপের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হলো। যারাই এই নতুন ধর্মমতে আশ্রয় নিল, তারাই পেল বিবেক-বুদ্ধির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এমনিভাবে ইসলাম, ধর্মের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিপীড়িতদের আশ্রয় হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ালো।

যে দেশে এর জন্ম, সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থানেই ইসলামের সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, গণতান্ত্রিক নীতি এবং একেশ্বরবাদের সৃষ্টি। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং স্বৈরাচার আর বহিঃশক্তির নির্মম আক্রমণে জীর্ণ চারপাশের দেশগুলোর মধ্যেও আরবরা তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। মিশর, পারস্য এমনকি খ্রিস্ট জগৎ থেকেও নির্যাতিত সম্প্রদায়গুলো স্বাধীন এবং অতিথিপরায়ণ মরুদেশের দিকে পালিয়ে এসেছিল, কারণ সেখানে তারা যা ভাবত, তা প্রকাশ্যে বলতে পারত। আর

যা প্রকাশ্যে বলত তা কাজে পরিণত করত। পারসিয়ানরা যখন আসিরীয় সাম্রাজ্য দখল করে নিল, আর সেই সাথে 'মেহজাহ'-রা যখন ব্যাবিলনের বেদি দখল করে নিল তখন নিসর্গ-পূজারি (সারিয়ান) পুরোহিতরা তাদের প্রাচীন বিশ্বাস এবং জোতির্বিদ্যায় অঢেল জ্ঞান নিয়ে পাশের মরুভূমির দিকে পাড়ি জমাল। এর আগে আসিরীয় আক্রমণে বহু একনিষ্ঠ ইসরাইল বংশীয়দের চলে যেতে বাধ্য করেছিল অতিথি সেবাখ্যাত মরু প্রান্তরে। জন ব্যাপটিস্ট পর্যন্ত সকল হিব্রু নবীই আরব মরুভূমিতে বসবাস করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন এবং ধর্ম প্রচার করেছেন। আসিরিয়ানদের ওপরে অন্যায়ের প্রতিকার হয়েছিল আলেকজান্ডারের আক্রমণে। আর সেই সাথে জরথুস্টের একান্ত ভক্ত শিষ্যদের যারা গ্রিসের পৌত্তলিক মতবাদ মেনে নিজ বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে চাইল না, তারাও আরব মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে গিয়ে তাদের ব্যাবিলনের প্রতিপক্ষের সাথে হাত মেলাতে বাধ্য হলো।

প্রাচ্যের গ্রিক আধ্যাত্মিক-দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা এবং খ্রিস্টীয় রীতি-নীতির শংকরসৃষ্টি নৌস্টিকবাদ[১] (Gnosticism) এবং ম্যানিকেয়াবাদ[২] (Manichaeism) একই সাথে স্বচ্ছন্দে আরবের মুক্ত বালুরাশির মধ্যে বেড়ে উঠেছিল। গোড়া ক্যাথলিক চার্চের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত নেস্টোরিয়রা, জ্যাকোবিয়রা এবং ইউনিটিসিয়রা আরব আতিথেয়তার মহামিলন তীর্থে মিলিত হতে বাধ্য হলো। বিভিন্ন মতবাদ ও ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী নির্বাসিত মানুষ এমনিভাবে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করে পরস্পরকে বুঝবার সুযোগ পেল এবং তাদের নানা মতের মধ্য দিয়ে একটা সাধারণ সত্যের সন্ধান পেয়ে গেল। সহনশীলতার এক শান্ত পরিবেশ পরধর্মের প্রতি বিরোধিতা কিংবা ভিন্ন মতাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করার উৎসাহ একেবারে শেষ হয়ে এল। আর বেদুইনদের হস্তগত হলো জ্ঞানবৃদ্ধ অতিথিদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল বিষয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রাচীন ধর্মমতগুলোর যা শ্রেষ্ঠ তাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেল মরুভূমির এই অসভ্যরা। আর এই অবদান হলো স্বর্গমর্তের মালিক সর্বশক্তিমান এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস যিনি যুগে যুগে তার প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে মর্তভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। এরই ভিত্তিতে নতুন ধর্মমতের আদর্শ গড়ে তোলার জন্য মোহাম্মদের আবির্ভাবের আগেই আরবদের আধ্যাত্ম জাগরণের মধ্যে ইসলামের সারমর্ম দানা বেঁধে উঠেছে। ইসলামের

---

[১] খ্রিস্টযুগের গোড়ার দিকে নৌস্টিক (Gnostic) নামে একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তারা মনে করত বিশ্বাসে নয়, জ্ঞানেই মুক্তি। তারা কাজ ও ব্যক্তিত্বের ওপর রূপকের আরোপ করেছিল। সেই সাথে মনে করেছিল মূল সত্তা থেকে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিজীবনের উদ্ভব। এদের এই মতবাদই 'নৌস্টিকবাদ বা Gnosticism।

[২] ইকবাটানা-র (Echbatana) অধিবাসী 'ম্যানি' (Mani) ২১৫ থেকে ২৭৬ খ্রিস্টাব্দ তার স্থিতি। তাঁর মতবাদ ছিল ভালো এবং মন্দ, আলো এবং আঁধার এই দুই মূল উপাদান থেকে জগতের সব কিছুর উৎপত্তি। তাঁর অনুবর্তীদের বলা হতো 'ম্যানিকায়েন' (Manichaen) বা 'ম্যানিকি' (Manicheis)। তাঁর মতবাদের নাম ম্যানেকেয়াইবাদ বা Manichacism।

মহাশক্তি, মোহাম্মদের সৃজনী ক্ষমতার সৃষ্টি কিংবা আকাশ থেকে হঠাৎ তার ওপর পড়া কোনো বিষয় নয়। এ হলো আরব জাতির ওপর সঁপে দেয়া ইতিহাসেরই অসমাপ্ত কাজের দায়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মানব-সভ্যতার এই মহান অবদানের মূল্য অনুধাবন এবং দেশবাসীকে তা স্বার্থকভাবে অবহিত করাই ছিল মোহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব।

আরবদের মধ্যে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা সৃষ্টির পরও কিছুটা অভ্যাসবসত আবার কিছুটা গোষ্ঠীস্বার্থে তারা সেই পুরনো বহু দেবতার উপাসনাও করত। ইতিহাসের ঐতিহ্য হিসেবে পুরনো ধর্মগুলো থেকে তাদের যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ, সে কারণেই তাদের প্রয়োজন হলো উপাসনার ধারা পরিবর্তনের। এই উদ্দেশ্য সাধনে সার্থক প্রচেষ্টা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, আর এই অভিযান পরিচালনার উপযুক্ত ঘাঁটি করা হয় মক্কায়।

বিভিন্ন দলের স্বাধীনতা এবং আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মক্কায় নিষ্পত্তি হয়ে সেখানেই শেষ হলো। ব্যবসার সকল পথ এখানে এসে মিশল। অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং হিতবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন জাতি এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক গড়ে তুলল এই মক্কায়। বিশাল মরুর দূরদূরান্ত থেকে যেসব গোত্রের মানুষ মক্কার বাজারে আসত, তারা কাবায় মন্দিরে পূজা করে যেত। এরা সবাই তাদের পূজ্য-দেবতার একটা প্রতীক এনে সেখানে রাখত। কম করে হলেও তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল এই মন্দিরে। এদের মধ্যে ছিল মানুষ, ঈগল এবং সিংহের মূর্তি। মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল ধনাঢ্য কোরায়েশদের, আর মন্দিরের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় ক্ষমতাধর হাশিম পরিবার। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সত্য, জাতির প্রাণকেন্দ্রে যারা, তারা অনুভব করবে যে, নতুন বিকাশমান বিশ্বাসের প্রাণশক্তি জাতীয় ঐক্যে আর্থিক অবস্থা আরও বিকশিত হবে। সেই কারণে হাশিম পরিবারেরই একজন প্রথম এই নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

হাশিম পরিবার এবং কোরায়েশগোষ্ঠী একবার নতুন ধর্মে দীক্ষিত হলে অল্প সময়েই সমগ্র জাতি তাদের অনুসরণ করবে। বাণিজ্যের জন্য সব গোষ্ঠীকেই মক্কা যেতে হয়। যারা মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে তারা সমগ্র জাতিকে খুব সহজেই ধর্ম এবং জাতীয় চেতনা বিষয়ে নির্দেশনা দেবে। কিন্তু কোরায়েশদের সংস্কার এবং আবহমানকালের অভ্যাস তাদের এই আত্মীয়জনদের আন্তরিক ও কঠিন প্রয়াসের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তাদের ভয় ছিল কাবা মন্দিরে পূজা-উপাসনা বিঘ্নিত হলে মক্কা থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে যাবে। কিন্তু যখন যোগ্য নেতৃত্ব ব্যর্থ হলো তখন অনেকেই এই বিপ্লবের নেতৃত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল। নবীর এই নতুন উদ্যোগের সহায়ক হলো মদিনা। অন্য জায়গা থেকেও এই এক হবার অহ্বানে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেল। মক্কার আধিপত্য কমে গেল। এক এক করে অনেক পরিবারই কোরায়েশদের গোঁড়ামির গন্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসে যোগ দিল বিপ্লবী

হাশিমিদের সাথে। অল্প দিনের মধ্যে কোরায়েশরা তাদের বিতাড়িত পরিজনদের কাছে পরাজয় স্বীকার করল কেবলমাত্র 'বিশ্বাসীর অধিনায়কের রাজদণ্ড অধিকার করার উদ্দেশ্যে। নবীর অনুসারীরা মক্কা দখল করেই তাৎক্ষণিক আইন জারি করে দিল যে, এই পবিত্র ভূমিতে কোনো অবিশ্বাসীকে ঢুকতে দেয়া হবে না। সমগ্র জাতিকে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করা হলো অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করার ভয় দেখিয়ে। কাবা মন্দির থেকে সকল দেবতা সরিয়ে ফেলা হলো। এবং কাবা হলো 'মোহাম্মদের আল্লাহ'র পবিত্র উপাসনার স্থান। নতুন ধর্মের কাঠামো দাঁড়িয়ে যেতেই সমগ্র জাতি সেই ধর্মের আশ্রয়ে এসে ভিড় করল। ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। প্রচার শুরুর আগেই তাই সমগ্র জাতির মনের অজান্তেই এই বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠছিল। এর প্রতিষ্ঠা ছিল অর্থনৈতিক স্বার্থের দাবি।

অধ্যায় চার

বিজয়ের কারণ

যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক পরিবেশে ইসলামের সৃষ্টি সেই পরিস্থিতিই ইসলামে সহনশীলতা এনে দিয়েছে, যাকে সাদা চোখে ইসলামের গোঁড়া অনমনীয় ভাবের সঙ্গে অসামঞ্জস্য বলেই মনে হয়। আসলে এতে কোনো অসঙ্গতি নেই। 'এক আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় নেই' ইসলামের এই মর্মবাণীই ইসলামকে সহিষ্ণু করেছে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, দোষ-ক্রটি নিয়ে সমগ্র জগৎ এবং নির্বুদ্ধিতা ও অসম্পূর্ণতা নিয়ে সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি। যারা এই আদর্শে বিশ্বাসী তারা অপরের অবাধ্যতা, অবিশ্বাস এবং মূর্খতাকে করুণার চোখে দেখতে পারে। কিন্তু তাদের এই ধর্মমত কোনোদিন একথা শেখায় না যে ঐ দুর্বল ভ্রান্ত মানুষগুলো কোনো খারাপ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। যারা অন্যভাবে উপাসনা করে, মুসলমানের দৃষ্টিতে তারা ভ্রান্ত এবং বিপথগামী, তবে একই আল্লাহর সৃষ্টি তারা। সেজন্য তারাও ভাইয়ের সমান। তাদের সৎ পথে আনা মুসলমানের কর্তব্য। কিন্তু তারা যতদিন স্বেচ্ছায় মুক্তির পথে না আসে ততদিন তাদেরকে সহজভাবেই মেনে নিতে হবে।

'আরবের নবী পৃথিবীকে কেবল কোরআন অথবা তলোয়ার দিয়েছে', তার অনুসারীদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের উত্থানের ইতিহাসে এক নেতিবাচক ছাপ রেখেছে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করত এই তৃতীয় ধারাটি; চাপা পড়ে গেছে। ইসলামের অভ্যুত্থানের এ এক প্রধান কারণ। আসলে বিকল্পগুলো দেয়া হলো ভিন্নভাবে। এ ছিল 'হয় কোরআন মানো, না হয় বিজয়ী আরবদের খাজনা-কর দাও'। এর কোনোটি গ্রহণ না করলেই কেবল 'আল্লাহর তলোয়ার' কোষমুক্ত হতো। আরব ব্যবসায়ীদের যে আর্থিক স্বার্থ একেশ্বরবাদী বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল তা অহেতুক রক্তপাতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। যেসব দেশের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সেসব দেশ জয় করে একক অখণ্ড রাজ্যের মধ্যে আসতে হবে। বিজিত জাতি নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে এই কাজ আরও সহজ হবে। কারণ তখনই বিশ্বাস এক একেশ্বরবাদী রাষ্ট্র দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবহার ব্যবসার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। সুতরাং কোরআন না মানার অপরাধে কৃষক শ্রমিক সাধারণকে হত্যা কিংবা সমৃদ্ধিশালী নগর ধবংস করা ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। যা প্রয়োজন ছিল তা হলো এই নতুন ধর্মমতে বিশ্বাসীদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করানো। নবীর অনুসারীদের অধীন অবিশ্বাসীরাও তাদের নিজেদের বিশ্বাস বজায় রাখতে এবং উপাসনা চালিয়ে যেতে পেরেছে।

জেরুজালেম যখন খলিফা ওমরের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন এই বিজিত নগরীর অধিবাসীদের ধর্ম ও সম্পদ তাদের হাতেই ছিল এবং তাদের উপাসনার স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ন ছিল। খ্রিস্টানদের এবং তাদের প্রধান যাজক ও তার অনুচরসহ বসবাসের জন্য নগরের ভিন্ন এলাকা ছেড়ে দেয়া হলো। এই আশ্রয়ের বিনিময়ে সমগ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর নামমাত্র দুই স্বর্ণমুদ্রা কর ধার্য করা হয়। বাণিজ্যিক স্বার্থ বিবেচনা করে বিজয়ী মুসলমানরা এই পবিত্র নগরীতে তাদের তীর্থযাত্রার অধিকার খর্ব তো করলই না বরং উৎসাহিতই করল। চারশ' ষাট বছর পর জেরুজালেম ইউরোপের খ্রিস্টীয় ধর্মযোদ্ধাদের অধীন খ্রিস্ট শাসনে গেলে 'প্রাচ্যের খ্রিস্টানরা সদাশয় আরব খলিফাদের শাসনের অবসানে অনুশোচনাই করেছিল'। (Gibbon : Rise and fall of the Roman Empire)

মুসলমানদের সহনশীলতার বিপরীতে খ্রিস্টানদের জেরুজালেম দখলের এই বিবরণ প্রণিধানযোগ্য, 'ব্যক্তিগত বা সাধারণ সম্পত্তি লুট করতে গিয়ে দুঃসাহসীরা প্রথম দখলকারীদের নিজস্ব সম্পত্তিকে শাসন করতে সম্মত হলো। খ্রিস্টানদের দেবতার কাছে এই বিপথগামী ধর্মসেবকরা একটা বলিদানই করল। বাধা তাদের আরও উত্তেজিত করেছিল। বয়স কিংবা স্ত্রীলোক কোনো বিবেচনাই তাদের রাগ কমাতে পারেনি। তিন দিন ধরে অভাবনীয় হত্যাযজ্ঞের মধ্যে তারা গা ভাসিয়েছিল। সত্তর হাজার মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা এবং মন্দিরের মধ্যে নিরীহ ইহুদিদের পুড়িয়ে মারার পরও তাদের হাতের অসংখ্য বন্দিকে কোনো দুর্বলতা কিংবা স্বার্থের জন্য না মেরে ছেড়ে দিয়েছিল।' (প্রাগুক্ত)

খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান শাসনামল কিংবা আধুনিক নির্ভরযোগ্য সব ঐতিহাসিকের প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কট্টর গিবন এই উপসংহারে এলেন যে, 'মোহাম্মদ বিনা দ্বিধায় খ্রিস্টান প্রজাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের, ধনসম্পদের। আর দিয়েছিলেন তাদের নিজ নিজ উপাসনা করার অধিকার।' এই মহৎ সহনশীলতার নীতি বেশ কঠোরভাবেই পালন করা হতো। শুধু মোহাম্মদের উত্তরাধিকাররাই নয়, সমগ্র আরব আমলেই এই নীতি মেনে চলা হতো। এর পরিসমাপ্তি ঘটে আরবরা তাদের ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে সরে গেলে এবং তাদের হাত থেকে শাসনভার বর্বর তাতারদের হাতে চলে গেলে। এমনকি প্রথম তুর্কি সুলতানের আমলেও ইসলাম তার সহনশীলতার মূলধারা থেকে কখনই পুরোপুরি সরে যায়নি।

ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল সময়েও তার স্বাভাবিক পরমতসহিষ্ণুতা কেবল মুক্তচিন্তা এবং যুক্তিবাদেরই প্রশ্রয় দেয়নি, বরং ধর্মীয় গোঁড়াদের চোখে তা রূপ নিয়েছিল অবিশ্বাসী ও অধর্মীতে। বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফাদের প্রথমদিকে অনেকেই শুধু যে ইহজাগতিক বিজ্ঞান পাঠে নীরব ছিলেন তা-ই নয়, চিন্তার মুক্তির

জন্যও তাঁরা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এদের মতে অনেকে, যেমন মোতাশেনরা আবার কোরআনের স্বর্গীয় উৎপত্তির কথাও বিশ্বাস করত না।

আরব সাম্রাজ্য শত শত বছর ধরে নির্যাতিত ইহুদিদের সাদর আশ্রয় দিয়েছে; সেই সাথে আশ্রয় দিয়েছে উদারপন্থী খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী নেস্টোরিয়ান, জ্যাকোবীয়, ইউটিসিও এবং পলিসিওদের। আরব সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে গেলে ক্যাথলিক চার্চের প্রতিও উদারতা দেখিয়েছে। অনেক খ্রিস্টান ঐতিহাসিকও এর পক্ষ নিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে খ্রিস্টান ঐতিহাসিক রেনোদঁর বক্তব্য নেয়া যেতে পারে : 'খ্রিস্টান গোত্রপ্রধান, ধর্মযাজক বা পুরোহিতদের পদ-পদবি, তাদের অধিকার এমনকি তাদের পারিবারিক বিষয়াদির ব্যাপারেও মিশরের মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। অনুগত খ্রিস্টানদের অনেককেই তাঁরা সচিব পদে এবং চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে তাদের বড় হবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এমনকি এদের অনেক উপযুক্ত লোককে নগর ও প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছে।' বাগদাদের একজন খলিফা তো ঘোষণা করেছিলেন যে, পারস্যের শাসন কাজে খ্রিস্টানরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। আরব সাম্রাজ্যের প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে নির্ভীক সংস্কারবাদী পলিসীয়রা ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে পেয়েছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তাছাড়া অধঃপতিত ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার করে খ্রিস্টধর্মকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে তারা আরব খালিফাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করে।

জরথুস্টের প্রাচীন ধর্মের 'ভালো' ও 'মন্দ'র মারাত্মক দ্বৈতনীতি 'এক আল্লাহ'য় বিশ্বাসীদের কাছে ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর। তবুও বিজয়ী আরবদের সহনশীলতা থেকে এই মতবাদে বিশ্বাসী পারসিরা একেবারে বঞ্চিত হয়নি। হিজরির তিন শতাব্দীর শেষেও সাধারণ মসজিদের পাশে অগ্নিদেবতার প্রাচীন মন্দির জাঁকজমকের সঙ্গে শোভা পেয়ে আসছে। গোঁড়া ইসলামের তলোয়ারের নৃশংস আঘাতে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের এই মন্দির চূড়া ধবংস হয়নি। পূজারি এবং পুরোহিতদের মন্দির ত্যাগের কারণেই এদের ধবংস এবং বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। গ্রিস থেকে ওক্সাস পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের অধিবাসী পারসিরা আশ্চর্য তৎপরতায় বিনা দ্বিধায় যেভাবে তাদের আবহমানকালের ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে এই বিজয়ীদের ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা বল প্রয়োগ করে সম্ভব হতো না। পুরনো বিশ্বাস ক্ষয়ে যাচ্ছিল। একটা সুসংস্কৃত জাতির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা তারা মেটাতে পারছিল না। 'সূর্য ও আগুনের' আলোকোজ্জ্বল দীপ্তি খারিমানের ভীতিকর ছায়ায় রাহুগ্রস্ত হচ্ছিল। পারস্যের জনগণ অনন্ত অকল্যাণকারী নীতির অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে মোহাম্মদের সহজ একেশ্বরবাদকে গ্রহণ করে।

উত্তর আফ্রিকার কেবলমাত্র আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কার্থেজ পর্যন্ত অঞ্চলেই ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে খ্রিস্টধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও

এই ধর্মবিপ্লবের কারণ, নতুন ধর্মে সহনশীলতার অভাব নয়, পুরাতন ধর্মবিশ্বাসের জীর্ণদশা আর চরম বিশৃঙ্খলার পরিণতি। অগাস্টিন, এথানাসিয়াস এবং সাইপ্রিয়ানদের দক্ষতা, সাধুতা এবং প্রতিভার বলে এখানে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টীয় মতবাদ এরিয়ান ও দেনতীয় বিরুদ্ধতায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এদের নেতৃত্বে গরিব জনগণ ধর্মের বাতাবরণে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল ক্যাথলিকরা প্রচণ্ড রোষে তা দমন করল। যার ফলে ধবংস হলো সম্পদশালী প্রদেশগুলো। এরপর ভ্যান্ডাল এবং মুরেরা এমন নির্দয়ভাবে ধবংসাবশেষের ওপর আঘাত হানল যার ফলে তাদের সামাজিক অবস্থা হলো শোচনীয় এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রায় মৃত্যু ঘটল। এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় মিথ্যা শান্তির মোহে নিমজ্জিত মানুষের মতো অবাস্তব সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে আশ্রয় চাইল।

গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত সামাজিক প্রতিবেশ এবং আধ্যাত্মিক পরিস্থিতির মধ্যে আরবের নবীর বলিষ্ঠ অভয়বাণী বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আশার আলো দেখাল। নতুন ধর্মের ইহকালের সুখ এবং পরকালের শান্তির বাণী সাধারণ মানুষকে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ইসলামের বিজয়ের জয়ডঙ্কার নিত্যদিনের সংগ্রামের মধ্যে তাদের মৃতপ্রায় মন এবং নানা কুসংস্কার একটা স্বর্গীয় আবরণে গড়ে উঠে। খ্রিস্টের বাণী বিকৃত হতে হতে এমন এক ভ্রান্ত সন্ন্যাসবাদের মধ্যে গিয়ে পড়ে যে সেখান থেকে উঠে আসার আর কোনো পথই থাকে না। হতাশার অতলে তলিয়ে যাওয়া মানুষের চোখের সামনে ইসলাম এক নতুন আশার আলো দেখায়। এতে সমাজে যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব স্বাভাবিক সাহস ও কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। ইসলামের জীবন সঞ্চারী অনুপ্রেরণায় উত্তর আফ্রিকার উর্বর মাটি আর পরিশ্রমী মানুষ অল্প সময়েই ফললাভ করে এবং সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

'এ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে, কেবল তলোয়ার দিয়েই আরবদের অগ্রাভিযান। তলোয়ার কোনো জাতির জীবনের স্বীকৃত মতবাদ পাল্টে দিতে পারে কিন্তু তা কোনোদিন মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই যুক্তি গভীর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন এশিয়া ও আফ্রিকার সমাজ ও পারিবারিক জীবনে মোহাম্মদের ধর্ম বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল, তার কারণ আরও গভীর। ...বিজিত দেশগুলোর সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যেই এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। তাদের ওপর থেকে ধর্মের প্রভাব অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল কেবল তত্ত্ব। ... অশিক্ষিত মানুষ, সাধারণ বিষয়গুলোই যাদের বুঝানো কঠিন, তারা ধর্মতত্ত্বের গভীর রহস্য বুঝবে কী করে? তবুও তাদের শেখানো হতো এই মতবাদেই মানুষের মুক্তি কিংবা অধঃপাত নির্ভর করে। তারা দেখল... ব্যক্তিগত পাপ-পুণ্যের বিচার হয় না। অসৎ কাজের জন্য নয়, পাপের মান মাপা হয় ধর্মীয় নির্দেশ পালন না করার মাপকাঠিতে। ধর্মযাজকরা কীভাবে নরহত্যা, বিষ প্রয়োগ, ব্যভিচার, চক্ষু তুলে নেয়া, দাঙ্গা, রাজদ্রোহিতা এবং গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে

পড়েছিল এসব ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শাসনকর্তা বা দলপতিরা ক্ষমতা দখলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরের মূলোৎপাটন করত এবং পরস্পরকে অভিশাপ দিত। তারাই খোজাদের ঘুষ দিত সোনা, রাজপরিবারের নারী ও সহচরীদের মন ভুলাত স্বর্গীয় প্রেম বিতরণের প্রলোভন দেখিয়ে এবং তারা নানা অসদুপায়ে ধর্মপরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করত, সস্তা বুলির কপচানিতে, যেমনি বক্তারা জনতাকে চঞ্চল করে তোলে, ঠিক তেমনি! তাদের মুখে কোনোদিন মানুষের চিন্তা-শক্তির স্বাধীনতা কিংবা সাধারণ অধিকারের কথা শোনা যায়নি। বরং যে মঠাধ্যক্ষরা রাজসৈনিকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করত, বড় বড় নগরে দাঙ্গা বাধাতেও দ্বিধা করত না, তারাই আবার ধর্মতত্ত্বের নিয়ম-নিষ্ঠার কথা নিয়ে চেঁচিয়ে বেড়াত। এরকম অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি উদাসীনতা এবং বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কী আশা করা যায়? যে আচার মানুষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, তাকে সাহায্য করার কথা আশা করা যায় না।'

'তাই যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাকবিতণ্ডা এবং বিভিন্ন দলের কলহ-কোন্দলের অরাজকতার মধ্যে সারাবিশ্বে 'এক আল্লাহ ছাড়া দুই নাই' রণনিনাদ ঘোষিত হলো তখন যে সকল গোলযোগ থেমে যাবে তাতে আশ্চর্যের কী? আর সমস্ত এশিয়া ও আফ্রিকা যে পদানত হবে তাও আশ্চর্য নয়। স্বাভাবিক সময় দেখা যায় দেশপ্রেম ধর্মের চেয়ে গৌণ, কিন্তু তখন সে অনুভূতিও তাদের ছিল না।' (J.W. Draper, 'History of the Intellectual Development of Europe, vol-1 pp-332-33)

সাম্যের যে নীতি মোহাম্মদের অনুসারীরা প্রচার করলেন, আরব উপজাতিগুলোর আবহমানকালের স্বাধীন যাযাবর জীবনের মধ্যেই তার মূল নিহিত ছিল। তাদের জাতীয় বৃত্তি দস্যুতায়ও তারা সমান বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। তাদের পুরনো দিনের গতানুগতিক জীবনধারা যখন রাজ্য জয়ের বিরাট রূপ নিল তখন কোনো আরবীয়ই ভুলল না যে, তার ঘোড়া দ্রুতগামী এবং তার তলোয়ারের ধারও কোনে অংশে কম নয়। তাই তাকে তার নিজ মরুগৃহ রক্ষা করতে যুদ্ধ করতে হয়েছে সিসোস্ত্রিস এবং সাইরাস, আলেকজান্ডার এবং ডেরিয়াস, পম্পে এবং আসিরওঁয়া, টলেমি এবং ট্রাজানের বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। পরে যখন অবস্থা পাল্টাল তখনও তার মহত্ত্ব কমল না। তবুও ইসলামের অভূতপূর্ব বিজয়ের যতটা আরব বীরের তলোয়ারের জোরে, তার থেকে অনেক বেশি ইসলামের মূলমন্ত্র সাম্য ও মৈত্রীর নীতিতে। যা সেসময়ে শ্রেণী ও জাতিভেদে জর্জরিত রোমান, বাইজেনটাইন, পারস্য এবং পরে ভারতবর্ষের সমাজ যে দমনমূলক আইন-কানুনে শাসিত হতো তার সঙ্গে বিরোধিতাই করল। ইসলাম দেখা দিল জীর্ণপ্রায় প্রাচীন সভ্যতা থেকে বিদায় নেয়া সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে।

আরবরা যখন প্রাচীন সভ্যতাসমূহের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হবার গৌরব লাভ করল, তখন তাদের লক্ষ্য হলো সেই ধবংসগুলোর মধ্যে শ্বাসরুদ্ধকর অগণিত মানুষকে রক্ষা করা। সেসময়ের পরিস্থিতি ইসলামের নাটকীয় প্রসারে যথেষ্ট

সহায়তা করেছে। এমন সময় ইসলাম এসেছে, যখন বিশ্ববাসী প্রাচীন সভ্য দেশগুলোর শাসকদের বিবেক বুদ্ধি এবং নানা অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত মানুষদের মধ্যে উন্নততর জগতের সন্ধান পাবার আশা তীব্র হয়ে ওঠে। এমন বিপ্লবাত্মক স্পৃহা থেকে জন্ম নেয় প্রথম শিশু খ্রিস্টধর্ম। কিন্তু প্রাচীন শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতিমূলক পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করার ফলে খ্রিস্টধর্মকে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা রক্ষায় পক্ষপাতী হতে হয় ফলে কোনো মঙ্গলজনক রূপান্তর না ঘটে বরং গতানুগতিকতাই প্রশ্রয় পেয়েছে। চার্চের পুরোহিতরা সহজেই ভুলে গেলেন যে তাদের পয়গম্বরও রোমক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। বরং তারা যীশুখ্রিস্টকে নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা হিসেবেই চিহ্নিত করলেন : 'সিজারকে তার প্রাপ্য দাও' এমন একটি উক্তি করে ধর্মকর্তারা তাদের প্রবর্তকের বাণী বলে প্রচার করেছেন, যা ইহুদি ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এর প্রেক্ষাপটেই খ্রিস্টধর্মের সৃষ্টি। যুগের প্রয়োজনে যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে খ্রিস্টধর্মের গোড়াপত্তন, শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একরকম সমঝোতা করে তারা সে আদর্শ হারিয়ে ফেলে। অসহায়দের এজগতের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের কোনো চেষ্টাই খ্রিস্টধর্ম করল না। বরং অশেষ দুধ-মধুর নহর বয়ে যাওয়া পরকালের মোহে তাদের মন ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করল। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার কেবলমাত্র ধৈর্যশীলদের অর্থাৎ যারা দুনিয়ার শাসকদের জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

খ্রিস্টধর্মের এই দুর্গতি আরও বলিষ্ঠ এক ধর্মের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক প্রয়োজন সৃষ্টি করল। ইসলাম তার অনুসারীদের কেবল স্বর্গের প্রলোভনই দেখায়নি। পার্থিব জগতের বিজয়ের জন্যও তাদের অনুপ্রেরণা দিল। প্রকৃতপক্ষে এই জগতে কীভাবে আসল সুখ-শান্তি পাওয়া যায় তারই ইংগিত দিয়েছেন আরবের নবী। মোহাম্মদ শুধু তার অনুসারীদের একটা জাতীয় জীবনের একতার ভিত্তিতে গড়ে তুললেন না; সমগ্র আরব জাতিকে এমন এক বৈপ্লবিক ঘোষণা দিয়ে দাঁড় করালেন যা পাশের দেশগুলোর নিপীড়িত অসহায় মানুষদের কাছে ব্যাপক সাড়া পেল।

ইসলামের বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ যেমন আধ্যাত্মিক তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিকও। ঐতিহাসিক গিবন এই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন : 'জরথুস্টের রীতির চেয়ে উন্নত এবং মুসার আইন-কানুনের চেয়ে উদার ছিল মোহাম্মদের ধর্ম। খ্রিস্টীয় সাত শতকে নানা রহস্যময় মতবাদ এবং কুসংস্কার খ্রিস্টের সুসমাচার ও সুশিক্ষার চেহারায় কালিমা লেপন করেছিল; আর এরই পাশে ইসলাম এসে দাঁড়াল এক অনাড়ম্বর অথচ বিবেক-বুদ্ধিসমৃদ্ধ চেহারা নিয়ে।' (Decline and fall of the Roman Empire)

পূর্ববর্তী অনুগামীদের সামরিক পরাক্রম নয় বরং মুক্তি ও সাম্যের বাণী ইসলামের অভিনব অভ্যুত্থান প্রসারের শক্তির উৎস, এই বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি

দেখাতে গিয়ে আর এক ঐতিহাসিক লেখেন : 'যেখানেই আরবরা কোনো খ্রিস্টান দেশ জয় করেছে সব ক্ষেত্রে ইতিহাস দুর্ভাগ্যক্রমে প্রমাণ করে যে বিজিত দেশের জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। দুঃখজনক যে, অধিকাংশ খ্রিস্টান সরকারের শাসনব্যবস্থা বিজয়ী আরবদের চেয়ে দুর্বিষহ ছিল। সিরিয়ার জনগণ মোহাম্মদের অনুসারীদের স্বাগত জানাল। মিশরীয় খ্রিস্টানরা তাদের দেশ আরবদের অধীনে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করল। আর খ্রিস্টান বেরবেররা তো মুসলমানদের আফ্রিকা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। কনস্টানটিনোপোল সরকারের বিরুদ্ধে এই দেশগুলোর তীব্র ঘৃণার জন্যই তারা মুসলমান শাসককে বরণ করে নিল। অভিজাতদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং জনগণের উদাসীনতায়ই স্পেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সহজেই আরবদের অধিভুক্ত হয়। (Finlay : History of the Byzantine Empire)

অধ্যায় পাঁচ

মোহাম্মদ ও তার শিক্ষা

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে অভিহিত করা হয় 'তিনি একমাত্র মানুষ যিনি মানব জাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে গেছেন'। (Draper : 'History of the Intellectual Development of Europe' vol-1 p-329) স্বর্গীয় বাণী প্রাপ্তির দাবি ছাড়া এই মানুষটির তেমন অস্বাভাবিক আর কিছুই ছিল না। অন্যান্য ধর্মে পয়গম্বর, ধর্মগুরু এবং সন্ন্যাসীদের তুলনায় এই দাবি কোনো অংশে কম বা বেশি অস্বাভাবিক নয়। খ্রিস্টানদের ঔদ্ধত্য আরবের নবীকে 'ভণ্ড' আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু অনেকে ভুলে গিয়েছিল যে মুসা ও যিশু খ্রিস্টের সাথেই তাকে এই আখ্যা দেয়া হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে বেনামে প্রকাশিত একটি বই ইউরোপে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অনেকে খ্রিস্টান রাজা ফ্রেডারিক বারবারোসা কিংবা মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশ্‌দকে এই বইয়ের রচয়িতা মনে করতেন।

যদি মোহাম্মদ 'ভণ্ড'ই হন, তাহলে তিনি নিজে সে ভূমিকা যতটুকু পালন করেছেন তার চেয়ে বেশি পালন করেছে অন্যরা, যারা কথিত স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের (অহি) কল্পনা বাস্তবায়িত করেছে এবং যাদের চেষ্টায় তা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একটা জাতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এর পেছনে কোনো অলৌকিকত্বের সমর্থন না থাকলে পরস্পর যুদ্ধরত আরবরা তা গ্রহণ করবে না। যারা অজ্ঞতায় পরিতৃপ্ত এবং পূর্বপ্রসূত ধারণা নিয়েই যাদের চিন্তা, তাদের যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না। ছোট ছোট ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তিগুলোকে এক বড় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আচ্ছন্ন করা সম্ভব। ছোটদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে বড়দের অনুগ্রহ লাভ করতে হয়। শক্তিমান এক ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রবল হলেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছোট ছোট ঈশ্বরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সহজ হবে। কোনো সার্বভৌম স্রষ্টা যদি না-ও থাকেন, তবুও তাকে আবিষ্কার করতে হবে। এই ছিল মোহাম্মদের চিন্তার ধারা। এর মধ্যে ভণ্ডামির কিছু ছিল না। আরবের নবীর প্রতিষ্ঠা পাবার হাজার বছর পর যুক্তিবাদী ভল্টেয়ার কি একই যুক্তি দেখাননি?

অবশ্য ভল্টেয়ারের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিক্রিয়াকে সমর্থন করা; কারণ জীর্ণপ্রায় সামন্তবাদী রাজতন্ত্রভুক্ত সমাজের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতেই এমন এক ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তিনি। কিন্তু মোহাম্মদ যে সময় এবং পরিবেশে এই যুক্তি দেখালেন তা ছিল একান্তই বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যপ্রসূত। মানুষের মন যখন অলৌকিকত্বের ওপর নির্ভরশীল হয়, তখন গতিশীল কোনো বিষয়কে সমাজে চালু করতে গেলে জনগণের ঐ বিশ্বাসেরই সাহায্য নিতে হয়। এছাড়া একেশ্বরবাদের ভাবনা মোহাম্মদের সৃষ্ট নয়। আগের অধ্যায়ে বর্ণিত সামাজিক পরিবেশই

একেশ্বরবাদের ধারণার জন্ম দিয়েছে। এই এক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণ আবিষ্কারেই মোহাম্মদের সার্থকতা। কারণ এ কথা সত্যি যে, কোনো জাতিকে কিছু বিশ্বাস করাতে হলে যাতে তাদের বিশ্বাস আসে এমন নজিরই তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

কিন্তু মোহাম্মদের ঈশ্বর অনুসন্ধানের মধ্যে ভল্টেয়ারের মতো নৈরাশ্যসুলভ হতাশা ছিল না। এ ছিল একজন সাধারণ মানুষের আন্তরিক অনুভূতির মহৎ প্রয়াস। আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মন যে প্রচলিত প্রক্রিয়ায় ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা লাভের আশা করে, সমগ্র আরব জাতিকে বাঁচাতে এমন এক মহাশক্তি ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে তিনি মরুভূমির মধ্যে সেই ধ্যান, উপবাস ও উপাসনায় আত্মমগ্ন হলেন। এমন সব ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে, তাই ঘটল।

'তিনি কতগুলো আধিদৈবিক চেহারার সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি আল্লাহর নবী, এমন দৈব বাণী শুনলেন। এমনকি পাথর ও গাছপালাও এমন উচ্চারণে শামিল হলো।' (Drapar, History of the Intellectual Development of Europe: vol-1) সাধনার মাত্রা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিকতার পর্যায় গেলে সাধারণত মানুষের এমন অভিজ্ঞতা লাভ হয়। অন্যান্য অনুভূতি থেকে মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারলে, কতগুলো দৃঢ় ধারণা, তা যতই কাল্পনিক বা অদ্ভুত হোক না কেন, মনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সাধকদের মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এই সত্য প্রমাণ করে যে, 'অনুপ্রেরণা' কিংবা অন্য কোনো 'ধর্মীয় অনুভব' কোনো আকস্মিক অথবা উদ্দেশ্যমূলক যৌগিক প্রক্রিয়া পরীক্ষার পরিণতি।

তাঁর আগে অথবা পরে এ ব্যাপারে অন্যরা যেমন করেছেন, মোহাম্মদ ঠিক তাই করেছেন। কিন্তু তাঁর বেলায় এমন কিছু ঘটল, যা তার কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি এমন একজন বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন যে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রমাণ বহনকারী মানসিক বিকারগ্রস্ত লক্ষণগুলোতে তিনি বিভ্রান্ত হলেন না। তাঁর ভয় হলো যে তিনি হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। বিপদের সময় সময়ের প্রয়োজনে বিচক্ষণ কেউ তার পাশে এসে না দাঁড়ালে তার আদর্শই হয়তো পরিত্যক্ত হতো। তিনি ছিলেন সাংসারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ধনী ব্যবসায়ী খাদিজা, যিনি তার স্বামীর মানসিক পরিস্থিতির আধ্যাত্মিক অর্থ সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁকে জোর দিয়ে বুঝিয়েছিলেন এতে অস্বাভাবিকতার কোনো লক্ষণ নেই বরং এ এক ঐশ্বরিক বার্তা। তাঁর এই মানসিক অস্থিরতার সুযোগে তিনি তাকে 'দেখালেন' এক স্বর্গীয় দূত তার হাতে আল্লাহর বাণী তুলে দিতে ঘরে ঢুকেছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, অজ্ঞতা, ভ্রান্তি এবং সংস্কারের মতিভ্রমের প্রতিবেশে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করলেই এমন নাটক সম্ভব। কিন্তু এভাবেই তো সকল ধর্মের জন্ম। এটা ভাববার কারণ নেই যে, ইসলাম এর ব্যতিক্রম কিছু। এর স্বাতন্ত্র্য শুধু এই যে, স্বর্গীয় সমর্থনের দাবি ছাড়া এতে ধর্মের গোঁড়ামি এবং আধিদৈবিক ধারণা ছিল কম; বরং রাজনৈতিক

চেতনা, প্রগতিশীল সমাজনীতি এবং ব্যক্তিগত আচরণের গ্রহণযোগ্য রীতিই ছিল বেশি। 'তিনি নিজেকে ধর্মতত্ত্বের অনাবশ্যক জটিলতার মধ্যে নিয়োজিত করলেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, বিচার এবং নামাজ-রোজা সংক্রান্ত নিয়ম-রীতি প্রতিষ্ঠা করে তার লোকদের সামাজিক উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন। গরিবদের প্রতি বদান্যতা দেখালেন এবং তাদের দান করাকে স্থান দিলেন সবার উপরে। যা আজকের দিনেও দেখা যায় না। এমন উদার মানসিকতা নিয়ে তিনি বললেন, যেকোনো ধর্মের পুণ্যবান সৎ মানুষই মুক্তিলাভ করবে।' (Draper, History of the Intellectual Development)

একজন অশিক্ষিত মানুষের রচনা কোরআন স্বাভাবিকভাবে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক রচনা নয়। এ কেবলই অশীলিত ভাবনা আর অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ অনুমানে ভরা। কোরআনের এই সুস্পষ্ট ত্রুটি এর উৎকর্ষকে, এমনকি একটি মহান ধর্মের উদ্দীপনাকেও ম্লান করে দিয়েছে। মোহাম্মদের ধর্ম ছিল কঠোর একেশ্বরবাদী। একেশ্বরবাদী হিসেবে এ ছিল দৃঢ় আপসহীন। এই অনন্য বৈশিষ্ট্য একে শ্রেষ্ঠতম ধর্মের সম্মান দিয়েছে। দার্শনিক দিক দিয়ে ঈশ্বরের ধারণাই ধর্মের ভিত্তি। 'না' এর মধ্যে দিয়ে কোনো কিছু সৃষ্টির সম্ভাবনা মেনে না নিলে সকল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। গ্রিস এবং ভারতবর্ষেরও প্রাচীন দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এই অদ্ভূত তত্ত্বকে বাদ দিয়েছিল বা মানতে পারেনি। ফলে আদিম যুক্তিবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ধর্মের শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো মৌলিক ধারণায় পৌঁছতে পারেনি। তার ফল হলো, হিন্দু, ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের মতো বড় ধর্মগুলোও শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরবাদেই শেষ হলো; যা যুক্তির বিচারে ধর্মের দেউলিয়াপনারই নামান্তর। সর্বেশ্বরবাদের বিশাল দুনিয়ার সাথে ঈশ্বরের অবস্থান, এই বিশ্বাস, ঈশ্বরের ধারণাকেই সন্দেহযুক্ত করে তোলে। এ সৃষ্টির ধারণাকে দূর করে দেয় যার পরিণতিতে ঈশ্বরের ধারণাও দূরে সরে যায়। পৃথিবী যদি নিজেই অনন্তকাল ধরে টিকে থাকতে পারে তাহলে এর স্রষ্টাকে খোঁজার প্রয়োজন হয় না। আবার সৃষ্টির কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হলে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন এক অপ্রয়োজনীয় কিছু।

মোহাম্মদের ধর্ম জটিল বিষয়কে সহজ করে দিয়েছে। 'না'-এর মধ্য থেকে 'হ্যাঁ' সৃষ্টির অযৌক্তিক মতবাদকে জোরের সাথে দাঁড় করিয়ে আদিম যুক্তিবাদের অসহায়তা থেকে ঈশ্বরের ধারণাকে মুক্তি দিল। ঈশ্বর আপন মহিমায় সমুন্নত হলেন। কেবল এক বিশ্ব নয়, অসংখ্য বিশ্বমালা সৃষ্টির সামর্থ্য তার অসীম ক্ষমতারই পরিচায়ক। এই ভেবে ঈশ্বরের ধারণার প্রতিষ্ঠা অনেকটা অন্ধবিশ্বাস নির্ভর এবং আদিম হলেও এ ছিল মোহাম্মদের কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্যই ইতিহাসে তিনি ধর্মের শুদ্ধতম রূপের প্রতিষ্ঠা হিসেবে স্বীকৃত। যুক্তিনিরপেক্ষতার চরম অভিব্যক্তির কারণেই ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ওপর সহজে বিজয়ী হতে পেরেছে। কারণ অন্য

সব ধর্মে তাত্ত্বিক উৎকর্ষ, মতবাদের সূক্ষ্মতা এবং দর্শনের ভিত্তি থাকলেও ধর্ম হিসেবে ছিল ত্রুটিপূর্ণ; আসলে ধর্মের নামান্তর মাত্র।

একেশ্বরবাদ অবশ্য একটা ভীষণ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তত্ত্ব। সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তা ধর্মবিষয়ক চিন্তার মূলে আঘাত করেছে। ঈশ্বরকে সবার ওপরে এবং জগতের বাইরে বসিয়ে তাকে ছাড়া চলার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কঠোরতম একেশ্বরবাদী ধর্ম হয়েও ইসলাম মানব ইতিহাসের গতানুগতিক ধর্ম শাসিত অধ্যায়কে রুদ্ধ করে দিল। তার সহজাত বৈশিষ্ট্য এমন সব সংস্কারমুক্ত দ্বার উন্মুক্ত করল যা ধর্মীয় ভাবনাধারাকে দেউলিয়া করে দিল এবং আধুনিক যুক্তিবাদী ধারার ভিত্তি স্থাপিত হলো। 'একেশ্বরবাদের কাজকর্মকে আমরা একটা হ্রদের সাথে তুলনা করতে পারি, যেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের স্রোত এসে ভিড় করছে, হঠাৎ কখন বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়বে, তারই প্রতীক্ষায়। বড় একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর মধ্যে তৃতীয় ইসলাম বস্তুবাদের খুব বেশি অনুকূল। এদের মধ্যে কনিষ্ঠতম হয়েও আরব সভ্যতাকে সর্ব প্রথম গৌরবোজ্জ্বল আলোর দীপ্তি দিয়ে এক সংস্কারমুক্ত দার্শনিক ভঙ্গি গড়ে তুলল যা প্রাথমিকভাবে মধ্যযুগে ইহুদীদের ওপর এবং পরোক্ষভাবে পশ্চিমের খ্রিস্টানদের ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলল।' (F. A. Lange, 'The History of Materialism' vol-1 p-174, 177) একেশ্বরবাদের শুদ্ধতম রূপ হওয়ায় ইসলাম এই ভূমিকা পালন করল। মৌলিক বিপ্লবী ভূমিকার মধ্য দিয়ে এর সমৃদ্ধি অর্জনে কোরআনের অপরিণতি কোনও বাধা হয়নি।

তার কঠোর একেশ্বরবাদই মোহাম্মদের ঈশ্বরের একমাত্র ভবিষ্যৎবক্তার দাবির বিরোধিতা করে। কোরআন অবশ্য ঈশা, মুসা, যিশু এবং অন্যান্য হিব্রু নবীদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি মেনে নিয়েছে। গোড়ার দিকে মোহাম্মদের দাবির বিরোধিতা না হলেও তাঁর সহযোগীদের অনেকেই গোপনে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। প্রতিষ্ঠাতার দেবত্ব ইসলামের মূল মতবাদবিরোধী। এর কঠোর একেশ্বরবাদিতার এ এক অবশ্যম্ভাবী ফল। মোহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার অনুসারীরা এই চূড়ান্ত প্রশ্নের মীমাংসায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। সিরিয়া বিজয় অভিযাত্রী সৈন্য-শিবিরে নবীর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছলে ধর্মপ্রাণ ওমর কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে, নবী মারা যেতে পারেন। বরং যে দূত তার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছিল তাকে কাফের মনে করে শিরশ্ছেদ করার হুমকি দিলেন। এতে ধীরস্থির আবু বকর আবেগপ্রবণ কনিষ্ঠ ওমরকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন : 'তুমি মোহাম্মদকে, না তার ইশ্বরকে পূজা কর? মোহাম্মদের ঈশ্বর চিরকাল বেঁচে থাকবেন। কিন্তু ধর্ম প্রচারক আমাদের মতোই মরণশীল। আর তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সাধারণ মানুষের পরিণতিই লাভ করেছেন।

লক্ষ করার বিষয় যে, মোহাম্মদের অব্যবহিত পরের উত্তরাধিকাররা তাঁর তিরোধানের মুহূর্ত থেকেই তাঁকে নবী না বলে ধর্ম প্রচারক বলেছেন। অনুসারীরা মোহাম্মদকে কম উঁচু অভিধায় একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবে অন্যান্য ধর্মগুরু এবং

বিধান দাতার পর্যায়ে ফেলেছেন। নবীর অবতারত্বের অস্বীকৃতি ইসলামকে একেশ্বরবাদের বিশুদ্ধতম পর্যায়ে উন্নীত করেছে। একবার নবীকে দেবত্ব আরোপ করলে তিনি সর্বনিয়ন্তায় ভূষিত হন। ঈশ্বরের একত্ব কিংবা আদি নীতির অখণ্ডতা তখন যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। সন্দেহজনক তত্ত্বকৌশলে এর বৈপরীত্যকে দূর করা হয়। বিশ্বাসের আদিম সরলতা হয় ধর্মতত্ত্বের গোঁড়ামি, না হয় আত্মপ্রবঞ্চনামূলক রহস্যবাদের মধ্যে হারিয়ে যায়। মতবাদের কঠোরতাকে বাদ দিলে ইসলাম এত কৃতিত্বের সাথে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের দাবি করতে পারত না। নবীকে দেবত্ব থেকে বঞ্চিত করা হলে বা তার এই দাবি সাধারণ্যে গৃহীত না হলে শাস্ত্র একক কর্তৃত্ব এবং অভ্রান্ত দাবি করতে পারে না। ফলে বিশ্বাসীদের মনও কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। একজন নশ্বরের শিক্ষা অনন্ত সত্যে মহিমান্বিত হতে পারে না এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনও চিরস্থায়িত্বের দাবি করতে পারে না।

দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামে গোঁড়ামির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী থেকে আসলে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনে অঢেল স্বাধীনতা ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আরবের চিন্তাবিদরা নতুন ধর্মের এই উদারতার স্বাধীন ও পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। মুসলিম তাত্ত্বিকরা খ্রিস্টীয় ত্রিতত্ত্ববাদকে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের বিকৃতি বলে মনে করল। মুসলমান তাত্ত্বিকরা ধর্মের মূল ধারণাকে প্রথমবারের মতো মানুষের মনে একান্ত বিমূর্তভাবে উপস্থাপন করল। (Vide Renan, 'Averroes et Averroeism', p-76) তারা ধর্মতত্ত্বের যুক্তিযুক্ততাকে অতুলনীয় সূক্ষ্মতায় প্রয়োগ করতে পারার কারণ, 'মোহাম্মদের একেশ্বরবাদ ছিল অবিমিশ্র এবং তুলনামূলকভাবে পৌরাণিক কল্প-কথার ভেজাল মুক্ত।' (F. A. Lange, 'The History of Materialism' vol-1 p-184) এই তথ্য প্রমাণ করে যে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা তার ধর্মের যে মৌলিক নীতিগুলো কোনো রকম দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন, তা ছিল বিশাল সম্ভাবনাময়। এবং এর দৃঢ় একেশ্বরবাদী চরিত্রের কারণে ধর্মীয় চিন্তার সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে তা এমন এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে এগিয়ে গেল যে, কালে কালে তা-ই নিরঙ্কুশ বিশ্বাসের যুগকে বন্ধ করে দিল। 'এমনকি গ্রিক দর্শন আরবদের কাছে পৌঁছানোর আগেই ইসলাম বহু গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠা করল। এদের কারো কারো ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, কোনো দার্শনিক গবেষণারই সে পথে আর আগানো সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে অন্যরা যা বুঝেছে এবং দেখেছে তার বাইরে অন্য কিছুই বিশ্বাস করে না। ... আব্বাসীয়দের ছত্রছায়ায় বসরার উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে যুক্তিবাদী একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যারা ধর্ম এবং বিশ্বাসকে মেলাতে চেয়েছিল। (প্রাগুক্ত পৃ: ১৭৭)

ইতিহাসের প্রথম পাঁচ বা ছয় শত বছরে ইসলাম এমন সব পণ্ডিত সৃষ্টি করেছে যারা স্বর্গীয় দেবদূত ইত্যাদির চেয়ে বেশি মনোযোগী হয়েছেন গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায়। আর কোরআনকে সরিয়ে রেখে ইহজাগতিক বই-পুস্তকের

সাধনায় গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। অনেক বিপ্লবী চিন্তানায়ক যুক্তির কাছে বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন অত্যন্ত কঠিনভাবে। একাদশ শতক পর্যন্ত বাগদাদ, কায়রো কিংবা কর্ডোভায় যে 'বিশ্বাসের সৈনিকরা' রাজত্ব করেছেন তাদের অনেকেই প্রাপ্ত জ্ঞানের চেয়ে প্রত্যক্ষ অর্জিত জ্ঞানকে বেশি মূল্য দিয়েছেন। বোখারার স্বাধীন সম্রাটরা ধর্মযাজকের চেয়ে কবিদের, ধর্মতাত্ত্বিকের চেয়ে চিকিৎসকদের বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্বাস প্রচারের চেয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ছিল তাদের বেশি উৎসাহ।

শুধু ইসলামের অগ্রযাত্রার ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশেষ প্রতিবেশের জন্যই জ্ঞানবুদ্ধির এমনি দুয়ার খুলে গিয়েছিল তা নয়, বরং এর বীজ নিহিত ছিল মোহাম্মদের ধর্মীয় মতবাদের মূলে। কোরআনের দুর্লভ বিষয় কিংবা ইসলামের বিশ্বাসের আদিমতা ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ দেয় না।

অধ্যায় ছয়

ইসলামী দর্শন

আরবীয়দের জ্ঞানচর্চা চলছিল প্রায় পাঁচশ' বছর, আর এই সময়ই ছিল ইউরোপের ইতিহাসের অন্ধকারতম যুগ। একই সময় ভারতবর্ষ অবনত ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যত্বের অধীন যা বৌদ্ধধর্মকে বিধ্বস্ত কিংবা বিকৃত করেছিল। বৌদ্ধবিপ্লবকে পরাজিত করার লজ্জাজনক কৃতিত্ব একরকম প্রশংসনীয় কাজ, কারণ এর পরিণতিতেই ভারতবর্ষ খুব সহজেই গিয়ে পড়ল মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে।

আব্বাসীয়, ফাতেমীয় এবং ওমাইয়াদের গৌরবোজ্জ্বল শাসনামলে একই সঙ্গে এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে। সমরখন্দ ও বোখারা থেকে ফেজ এবং করডোভা পর্যন্ত অসংখ্য পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সংগীত বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেন। গ্রিক দর্শন এবং শিক্ষার অমূল্য সম্পদ চাপা পড়ে গেল খ্রিস্টীয় চার্চের অসহিষ্ণুতা এবং কুসংস্কারের নিচে। আরবরা না থাকলে তা একেবারেই হারিয়ে যেত এবং এমন দুর্ঘটনার দুঃখজনক পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়।

অসার ধর্মানুরাগ এবং সাধুতার ভণ্ডামি খ্রিস্টানদের উসকিয়ে দিয়েছিল প্রাচীনকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অপবিত্র বলে অবজ্ঞা করতে। এই মূর্খতার অহংকারের পরিণতিতে ইউরোপের জনগণ মধ্যযুগের অন্তহীন অতল অন্ধকারে তলিয়ে যায়। প্রাচীন গ্রিক সাধকরা জ্ঞানের যে স্বর্গীয় আলোকবর্তিকা জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন তা নতুন প্রাণশক্তিতে বেঁচে ওঠায় অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যা সংস্কার এবং অসহিষ্ণুতার দুঃসহ আঁধার অবশেষে কেটে গেল। আর ইউরোপের জনগণ খুঁজে পেল ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি, বুদ্ধির অগ্রগতি এবং সেই সাথে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ। আধুনিক যুক্তিবাদের অধিকারী হয়েছেন আরব দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের মাধ্যমেই। রজার বেকন ছিলেন আরবদের শিষ্য। হাম্বলের মতে, 'পদার্থবিজ্ঞান বলতে আজ আমরা যা বুঝি, সেই জড়বিদ্যার আসল প্রতিষ্ঠাতা আরবরা।' (Hamboldt Kosmos : Vol-II)

প্রয়োগ পরীক্ষা এবং পরিমাপই তাদের বড় হাতিয়ার, যার সাহায্যে তারা অগ্রগতির পথ খুঁজে পেল এবং নিজেদের গ্রিক বিজ্ঞানের অর্জনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সেতুবন্ধ হিসেবে গড়ে তুলল।

আল কানদ্, আল হাসান, আল ফারাবি, আবিসেনা (ইবন্ সিনা), আল গাজ্জালি, আবুবকর, এভেন পেস (ইবন্ বাজ্জা), আল ফেট্রাজিয়াস (ইউরোপীয় ভাষায় লেখা ইতিহাসে আরবি নামগুলো এমনি সঙ্কুচিত হয়ে গেছে) মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই নামগুলো চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মহান ইবন্ রুশদ্-এর কীর্তি অমর হয়ে আছে এমন একজন মানুষ হিসেবে যিনি আধুনিক সভ্যতার অগ্রদূতদের পরিচয়

করিয়ে দিয়েছিলেন এরিস্টটলের প্রতিভার সঙ্গে। এভাবে ইউরোপের মানবতা তার ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং মধ্যযুগীয় বন্ধ্যা দর্শনের পক্ষাঘাতদুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্দালুসিয়ার সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় আরবের নবযুগের সূচনাকারী মহান আরব যুক্তিবাদিরা যে বিকশিত হচ্ছিল রজার বেকনের সুপরিচিত ঘোষণায় তা উচ্চারিত হয়েছে : 'প্রকৃতিকে বিকশিত করলেন এরিস্টটল আর এরিস্টটলকে প্রকাশ করলেন এভারোজ।'

খ্রিস্টধর্মের কর্তৃত্ব এবং ধর্মতন্ত্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে আধ্যাত্ম বিদ্রোহের পতাকা উড়েছিল ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে। যুক্তিবাদী বিদ্রোহীরা অনুপ্রেরণা পেয়েছিল প্রাচীন গ্রিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকে এবং তারা তা নিয়েছিল আরব পণ্ডিতদের কাছ থেকে, বিশেষ করে ইবন্ রুশদ্-এর কাছ থেকে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে সাধু জাস্টিনিয়ানের (Justinian) গোঁড়ামি শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মরাজ্য থেকে পৌত্তলিক শিক্ষার শেষ চিহ্নগুলোও অপসারিত করল। সবশেষ গ্রিক পণ্ডিতদেরও প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ত্যাগে বাধ্য করা হলো। রোম সাম্রাজ্য ত্যাগ করে তারা আশ্রয় চাইলেন পারস্যে। কিন্তু সেখানেও যাজকীয় অসহিষ্ণুতা এই লৌকিক শিক্ষার প্রতি একইভাবে বৈরী হলো। যার ফলে এথেনীয় সংস্কৃতির অনাবৃত পতিত বিজ্ঞান স্নেহছায়া পেল বাগদাদের আব্বাসি খলিফাদের রাজদরবারে। বিদেশি বিধর্মীদের জ্ঞানবুদ্ধিতে তারা এত মুগ্ধ হলেন যে, কোরআন কিংবা তলোয়ার কোনোটিই তাদের দেয়া হলো না। অন্যদিকে তাদের জ্ঞানবিশ্বাসকে বিদ্রূপ করত এবং সকল ধর্মের প্রতি পরিহাসকে প্রশ্রয় দিত, প্রাচীন বিদ্যার এমন অবশিষ্ট পণ্ডিতদেরও 'বিশ্বাসের সেনারা' আতিথেয়তা গ্রহণের উদার আহ্বান জানালেন।

খলিফা কেবল শরণার্থী গ্রিক পণ্ডিতদের আশ্রয়ই দিলেন না; প্রাচীন গ্রিক জ্ঞানীদের সম্ভাব্য সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করার পরামর্শ ও সামর্থ্য দিয়ে তারা উপযুক্ত লোকদের পাঠালেন রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। এরিস্টটল, হিপারকাস, হিপোক্রাটেস, গ্যালেন এবং অন্য বৈজ্ঞানিকদের মূল্যবান গ্রন্থ আরবিতে অনূদিত হলো। আর এই ধর্মবিরোধী শিক্ষা যাতে সমগ্র মুসলিম জাহানে বিস্তার লাভ করতে পারে খলিফারা তাতে বিপুল উৎসাহ দিলেন। অভিজাত থেকে সুতার-মিস্ত্রি পর্যন্ত সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠীভুক্ত হাজার হাজার ছাত্রকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে প্রতিষ্ঠিত হলো অসংখ্য বিদ্যালয়। গরিব ছাত্ররা বিনা পয়সায় শিক্ষা গ্রহণ করত। শিক্ষকরা তাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতেন। তাদের অবস্থান হলো সবার উপরে। আরব ঐতিহাসিক আবুল ফারাগিয়াস জ্ঞানীদের সম্বন্ধে খলিফা আল মামুনের যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তা হলা : 'তারাই ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি, তাঁর শ্রেষ্ঠ এবং উপযুক্ত সেবক, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষে তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। যারা জ্ঞান দান করেন তারাই প্রকৃত আলোকদাতা, তারাই যথার্থ বিধায়ক, তাদের সাহায্য ছাড়া এই বিশ্ব আবার অজ্ঞতা ও বর্বরতায় তলিয়ে যেত।

ইসলামের গোঁড়ামি এবং উগ্রতা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ঐতিহাসিক প্রমাণহীন হয়ে পড়ে যখন দেখি যে, শিক্ষিত মানুষদের নবীর উত্তরাধিকাররা উচ্চকিত প্রশংসা করতেন তাদের অধিকাংশেরই কোনো ধর্মমতের বালাই ছিল না। তাদের কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যে ধর্মের বিরোধিতা করতেন। তাদের শিক্ষার মর্মকথা ছিল, বুদ্ধিই মানুষের সত্য নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড। খলিফা আল মামুন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান হয়েও যেভাবে 'যৌক্তিক শক্তি বিকাশে' উৎসাহিত করেছেন, প্রমাণ প্রত্যাশী ছাত্ররা ইতিহাসে তেমনটি আর খুঁজে পাবেন না। কারণ যৌক্তিক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বিশ্বাসের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিহীন। তবুও আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে যারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং নিজেরাও তাতে অংশ নিয়েছেন, আল মামুন ছিলেন তাদেরই একজন। সংস্কারমুক্ত আব্বাসীয়রাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

আফ্রিকার ফাতেমিয়া এবং স্পেনের ওমাইয়ারা যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ধনৈশ্বর্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসার নিয়েও। কায়রোর গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ছিল এক লাখের বেশি আর কর্ডোভায় ছিল এর ছয়গুণ। এতেই প্রমাণ হয় যে, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার ধ্বংসের জন্য দায়ী করে ইসলামের অভ্যুত্থানকে হিংস্র ধর্মান্ধ বলে যে অপবাদ দেয়া হয় তা সত্য নয়। যারা মহান বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে আনন্দ পেয়েছে তারাই যে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে কিংবা যাঁরা মহামূল্যবান সম্পদ রক্ষা করে মানব জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রয়েছেন, তারাই যে সেই সম্পদ ধ্বংসের কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন, একথা যে বিশ্বাস করে সে হয় ধর্মনিষ্ঠ, না হয় সরল বিশ্বাসের কাছে প্রতারিতই হয়েছে। নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস পাঠ করলে যখন তা নানা কিংবদন্তি দূর করে আর নিরুৎসাহ করে বিদ্বেষমূলক সব গালগল্পকে তখন ইসলামের অভ্যুত্থানকে মানব জাতির জন্য অশুভ না হয়ে বরং আশীর্বাদ বলেই মনে হয়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা বইয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেয়ার মর্মস্পর্শী কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়, অথচ আরবদের দ্বারা তাদের দেশ বিজিত হবার পর পরই মিশরের দুই খ্রিস্টান ঐতিহাসিক ইউটিনিয়াস এবং এলমাসিন যে ইতিহাস লিখেছেন তাতে এই বর্বর কাজ সম্বন্ধে তারা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে নীরবই ছিলেন। এদের প্রথমজন ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার গোষ্ঠীপতি; তিনি যে খ্রিস্টধর্মের শত্রুদের পক্ষ নেবেন এমন সন্দেহ কখনও করা যায় না। এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রমাণস্বরূপ তাঁর সেনাপতিকে খলিফা ওমরের এক আদেশের কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। খ্রিস্ট যাজকদের রচনা গোপন করার যথেষ্ট উপায় ছিল। সুতরাং এদের রচিত কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নষ্ট করার চেয়ে ওমরের ওই আদেশ না লেখাটা ছিল অনেক সহজ। এ প্রসঙ্গে যত প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক গিবন মন্তব্য করেন : 'ওমরের এই কঠিন দণ্ডাদেশ প্রচলিত প্রাচীন মুসলমান কূটনীতিকদের নীতিবিরুদ্ধ। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধে

দখল করা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে কিছুতেই অগ্নিসংযোগ করা যাবে না এবং বিধর্মী বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক কিংবা কবিদের, চিকিৎসক অথবা দার্শনিকদের রচনাসমূহ আইনসম্মতভাবেই বিশ্বাসীরা ব্যবহার করবে।' (Rise and fall of the Roman Empire)

যখন থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস লেখা হচ্ছে তখন থেকেই আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার ধ্বংসের কাহিনীকে অবিশ্বাস করা হয়েছে, না হয় তাতে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। যেভাবেই হোক না কেন, আরবদের দ্বারা বিজিত হওয়ার সময় আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার আর গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল্যবান স্মৃতি নিদর্শনের ভাণ্ডার হিসেবে পরিগণিত হতো না। এর বহুকাল আগেই আলেকজান্দ্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক বুদ্ধির পরিবর্তে খ্রিস্টান ধর্মের গোঁড়ামিকে গ্রহণ করেছিল। সেভাবেই গ্রন্থাগারের বিষয়সূচীর চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছিল। খ্রিস্টীয় অসহিষ্ণুতা পৌত্তলিক পণ্ডিতদের যখন প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য করল, তখন তাদের কাছে অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে অমূল্য এই সম্পদরাজি যে সঙ্গে নিয়ে যাবেন তা-তো স্বাভাবিক। ওমরের আদেশেই যদি আগুন লাগানো হয়ে থাকে তাহলে ধর্মতত্ত্বের বাদানুবাদে ভরা যে বইগুলো মানুষের ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি করত, যেগুলোকেই পোড়ানো হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অযথা অহেতুক বাদ-প্রতিবাদ সৃষ্টিকারী মূল্যহীন বইগুলোই হয়তো কেবল ইসলামের আগুনে পুড়েছে। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বইগুলোতে আগুন লাগাবার অনেক আগেই প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মূল্যবান নথিপত্রগুলো সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সেগুলোকেই মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন খলিফা প্রশংসনীয় উৎসাহ এবং আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন, রক্ষা করেছিলেন, সেগুলোর যথারীতি উন্নতিও করছিলেন।

বাইজেনটাইন বর্বরতা টলেমিদের সব প্রশংসনীয় কীর্তি ধবংস করে দেয়। হাইপেরিয়ার বিখ্যাত মেলায় যে সেন্ট সিরিল (st. cyril) বাগদেবীকে কলঙ্কিত করেছিলেন, তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের আসল ধ্বংসকারী। এই ঘটনা ঘটেছিল পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই। যখন কেবল ধর্মান্ধ খ্রিস্টান ছাড়া প্রধান পুরোহিতের আন্তরিক অথচ দুর্বোধ্য ধর্মোপদেশ শুনতে আর কেউ যেত না। সে সময় একজন পেগান বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর কোনোটিতেই বিশ্বাসী নয় এমন যুবতীর দার্শনিক বক্তৃতা এবং গাণিতিক বিশ্লেষণী আলোচনাকে আলেকজান্দ্রীয় সুধীসমাজ পৃষ্ঠপোষকতা করবে, তা খ্রিস্টান যাজকের সহ্য হলো না। বুদ্ধির দিক দিয়ে তার ক্ষমতা না থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে চিরতরে শেষ করার শক্তি তার ছিল। তাঁরই প্ররোচনায় ধর্মোন্মাদ পাদরি বাহিনীর নেতৃত্বে এক বিদ্রোহী দল আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপীঠ আক্রমণ করে ধর্মের নামে নৃশংস অত্যাচার করল যা লেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং স্মরণ করাও লজ্জাজনক।

'এভাবে আমাদের সময়ের চারশ' চতুর্দশ বছরের বিশ্বের নাগরিক দর্শনের অবস্থান স্থির হয়ে গেল। এখন থেকে অন্ধকারে তলিয়ে গেল এবং গৌণ হয়ে

পড়ল। এর প্রকাশ ও অস্তিত্ব আর সহ্য করা হলো না। বাস্তবিকই একথা বলা যায় যে, এই সময় থেকে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেল। গ্রিক দর্শনের তীক্ষ্ণ শাণ দেয়া ইস্পাতকে গোঁড়ামির সীসার গদা আঘাত করে বিচূর্ণ করে দিল। সিরিলের কাজের কোনো প্রশ্নই উঠল না। এখন বোঝা গেল যে সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের কোথাও চিন্তার স্বাধীনতা রইল না। ... অনুমান করা যায় আলেকজান্দ্রিয়ায় যতদিন বিজয়ীদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন পর্যন্ত এই নির্দেশ তাদের কাজে লেগেছিল। কিন্তু আরবরা যখন নগরী দখল করে নেয় তখন এর প্রয়োগ কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরবর্তী দুই বিষণ্ণ ক্লান্ত শতাব্দী ধরে এরকমই চলল। অবশেষে বিদেশি আক্রমণকারীদের কাছে অত্যাচার ও পশুশক্তির সমাপ্তি ঘটল। আরবীয় বিজেতারা মুক্তকণ্ঠে যুক্তি দিয়ে তাদের তলোয়ারের কথা স্বীকার করল, আর তাতেই জগতের মঙ্গল হলো, তারা অতিমানবীয় প্রাজ্ঞতার ছলনা করল না। ধর্মতত্ত্বের বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে তারা মুক্তভাবে জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হলো; আর মিশর যে ভয়ংকর অন্ধ-গোঁড়ামি, অজ্ঞতা এবং বর্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল সেখান থেকে মুক্ত করে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলো।' (Draper : The History of the Intellectual Development of Europe. vol-1 p. 325)

প্রাচীন গ্রিক জ্ঞানী পণ্ডিতদের রচনাসমগ্র আরবরা কেবল উদ্ধারই করেনি, সংগ্রহ ও রক্ষাও করেছে। তারা ব্যাপক আলোচনা করে একে উন্নতও করেছে। প্লেটো, এরিস্টটল, ইউক্লিড, এপোলোনিয়াস, টলেমি, হিপোক্রাটস গ্যালনের সমগ্র রচনা আধুনিক ইউরোপের জনকরা প্রথম পেয়েছে আরবি অনুবাদের মাধ্যমে, পেয়েছে পাণ্ডিত্বপূর্ণ সমালোচনাসহ। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা, যা মানুষের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, আর প্রকৃতির মধ্যে যে একটা সুসংবদ্ধ নিয়মের রাজ্য আছে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করে এসব নিয়েও ঈর্ষান্বিত চর্চা করছে আরবরা। নতুন নিরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আরব দার্শনিকরা পৃথিবীর পরিধি এবং গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও সংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করে। তাদের হাতেই জ্যোতির্বিদ্যা তার আদিম রূপকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করল (জ্যোতিষশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ কথন)। সকল প্রাচ্য দেশের যাজকরাই কমবেশি এর চর্চা করল এবং একে যথার্থ বিজ্ঞানের রূপ দিল। যদিও আলেকজান্দ্রিয়ার ডায়োফান্টাস বীজগণিতের আবিষ্কারক তথাপি আরবীয় সংস্কৃতির যুগের আগে তা সাধারণ মানুষে চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি। প্রকৃতপক্ষে এর (বিজ্ঞানের) মূল যে আরব তা তার নামের মধ্যেই নিহিত আছে। কিন্তু আরবরা নিজেরাই অত্যন্ত বিনীতভাবে গ্রিক শিক্ষকদের কাছে তাদের ঋণ স্বীকার করেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই উদ্ভিদবিদ্যা চর্চা হয়েছিল। কিন্তু ডায়োসক্রিডেস্-এর দুই হাজার রকমের গাছ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। কিমিয়া বা আলকেমি (Alchemy) ছিল গুপ্ত বিদ্যা, প্রাচীন মিশরের পুরোহিতরা তাকে আগলে রেখেছিল। ব্যাবিলনেও এর চর্চা হয়েছে। বহুকাল পরে ভারতবর্ষের চিকিৎসকরাও রসায়নশাস্ত্রের কিছু কিছু জেনেছিলেন। কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং প্রাথমিক

উৎকর্ষ আরব সাধনারই ফল। তারাই পরিশ্রুতকরণের জন্য প্রথম বক-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। আর এর নামও তাদেরই দেয়া। তারা প্রকৃতির তিন রাজ্যের মাল-মশলার বিশ্লেষণ করলেন। ক্ষার (alkalis) এবং অম্লের (acid) পার্থক্য সহজ করে তুলতে চেষ্টা করলেন এবং মূল্যবান খনিজ পদার্থকে নমনীয় এবং উপকারী ঔষধে রূপান্তর করলেন।' (Gibbon : Decline and fall of the Roman Empire)

আরবরা সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানে। মাসুয়া এবং জেবার ছিলেন গ্যালেনের উপযুক্ত শিষ্য। এই মহাপণ্ডিতের কাছ থেকে যা শিখলেন, তারা তা আরও উন্নত করলেন। দশম শতাব্দীতে সুদূর বোখারায় ইবন্ সিনা জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তিনি পাঁচ শতাব্দীব্যাপী একচ্ছত্র আধিপত্য করে গেছেন। স্যালেরমোর বিদ্যালয়ই ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আরবরাই এর প্রতিষ্ঠাতা, আর এখানে ইবন্ সিনার শিক্ষাই দেয়া হতো।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে জ্ঞান আহরণের উদ্যোগই ছিল আরব পণ্ডিতদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বায়বীয় কল্পনার আত্মপ্রসাদ থেকে মুক্ত হয়ে তারা সুস্পষ্ট ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন। আরবীয় জ্ঞান আহরণের এই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় এদেরই প্রবীণ পণ্ডিত ইবন্ রুশদ্-এর বক্তব্যে : 'দার্শনিকদের কাছে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হলো, যা তাকে ঠিক তার চর্চা করা। ঈশ্বরের সৃষ্টির জ্ঞান ছাড়া আর কোনো উপাসনা নেই। যা তাকে জানার বাস্তবতার পথে নিয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে এই হলো মহত্তম কাজ। আর নিকৃষ্ট হলো এই সাধনার বশবর্তী হয়ে যারা এই ধর্মের বিশুদ্ধতম ধর্ম অনুভব করে, তাদের সে চেষ্টাকে ভুল এবং আত্মম্ভরিতার সমান বলে উড়িয়ে দেয়া।' যে ধর্ম ভাষার ভক্তিনিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গিতে এমন অধার্মিক মতবাদ প্রচারে সহায়তা করেছে, তার মূলে কখনও অন্ধ গোঁড়ামি কিংবা অসহিষ্ণুতা থাকতে পারে না। এই ভিন্নমতের দার্শনিকরা পুরোহিতদের ক্রোধ ডেকে আনলেও তা যতটা ছিল মুসলমানদের তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল খ্রিস্টানদের।

অল্প কিছুদিন নির্বাসনের পর ইবন্ রুশদ্ আন্দালুসিয়ার সুলতানের রাজ্যসভায় তাঁর হারানো সম্মান ফিরে পেলেন এবং ইসলামী বিশ্বে নিষিদ্ধ তার বইগুলো রক্ষা পেল। কিন্তু এর ল্যাটিন অনুবাদে উপরিউক্ত এবং অনুরূপ অংশগুলো বাদ দেয়া হলো। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে সনাতন খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তার সূত্রপাত এই আরব দার্শনিকদের রুদ্ধকণ্ঠের উচ্চারণ। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী ক্যাথলিক চার্চের যে অন্ধ গোঁড়ামি ইউরোপকে আধ্যাত্মিক দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল, এই আন্দোলন তার ভিতকে নাড়িয়ে দিল। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবার সময় পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত খ্রিস্টান যাজকদের দৃষ্টিতে ইবন্ রুশদ্-এর মতবাদ ছিল নাস্তিকতাতুল্য। অবশ্য এরকম হবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ কেবল ওপরে উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই বিজ্ঞানমুখী মনের অতীতকে বিদায় জানানোর ইঙ্গিত আছে। যে পুঞ্জীভূত অজ্ঞতা

এতদিন ধর্মবিশ্বাস আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে আসছিল এবং ধর্মতত্ত্বের জোরে পবিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে, তা ধীরে ধীরে অপসারিত হলো।

এই অধ্যায়ে সত্যিকার জ্ঞানের একমাত্র অভ্রান্ত পথ আরোহ (Inductive) পদ্ধতির মূল নীতির নির্দেশ দিয়েছেন ইবন্ রুশদ। স্রষ্টা যে একজন আছেনই, এমন পূর্ব ধারণা দূরে সরিয়ে তার সৃষ্টিরাজ্য থেকে ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান দিয়ে যদি তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয় (অন্ধবিশ্বাস থেকে এ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য আলাদা) তাহলে তার সে অস্তিত্ব ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। যে ধর্ম স্রষ্টার দৃশ্যমান স্বরূপ নির্ণয়ে নির্দেশ দেয়, ধর্মের আকারে তা মানুষের শ্রেষ্ঠতম এবং এভাবে সে সকল ধর্মের ভিত্তিকে নষ্ট করে দিল। এই-ই হলো এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের মূলকথা।

ইসলাম ও আরবি শিক্ষার কেন্দ্র ছিল সেসব ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, ইহুদি, পারসি আর গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে; সংঘাত সৃষ্টি করেছে আবার তা লোপ পেয়েছে। এই প্রাচীন সভ্যতার ভালো অংশ নিয়েই গড়ে ওঠে আরব সংস্কৃতি। মোহাম্মদের স্মরণীয় একেশ্বরবাদ প্রাচীন মানুষের ধর্মসমূহের মূল নীতিকে আপন করে নেয়। আরব দার্শনিকদের কৃতিত্ব এই যে, তারাই সর্বপ্রথম সকল ধর্মের এক অভিন্ন উৎপত্তির কথা বলেছেন। তারা কেবল এই ধারণা পোষণই করেননি বরং স্বীয়ভাবে এই বিস্তৃতি সাধন করে মত দেন যে, সকল ধর্মেই মানব মনের প্রচেষ্টায় জীবন এবং প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস আছে। তারা আরও অগ্রসর হয়ে দৃঢ়তার সাথে বললেন, প্রচেষ্টা এবং যুক্তির সমন্বয় হলো সবচেয়ে বড়, মহত্তম এবং মহামহিমান্বিত। ধর্মের যুক্তিবাদী এমন সূক্ষ্ম ভাবনা ইবন্ রুশদ-এর মনেই এসেছিল।

আধুনিক সভ্যতা বিকাশে এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতদের দার্শনিক তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে আরবদের কিছু মৌলিক দানও সংযুক্ত হয়েছে। এ হলো সংশয়বাদ, সকল বিশ্বাসের শক্তিশালী মীমাংসা। সমালোচনা যখন বিশ্বাসের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, তখন মানুষের অগ্রগতির পথে এক নতুন আলো দেখা যায়। বেনামিতে প্রকাশিত 'তিন ভণ্ড' নামের বইটি ইউরোপীয় সংশয়বাদের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল। এই লজ্জাজনক রচনার কৃতিত্ব হয় খ্রিস্টান নব্যতান্ত্রিক সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসার কিংবা মুসলিম দার্শনিক ইবন্ রুশদ্-এর। এই তিন ভণ্ড ছিলেন মুসা, যিশুখ্রিস্ট এবং মোহাম্মদ। বইয়ের দুই সন্দেহজনক লেখকের একজন খ্রিস্টান আর অন্যজন মুসলমান। ধর্ম নিঃসন্দেহে দুর্দিনে পড়েছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই সংশয়বাদের জন্ম হয়, কিন্তু যথার্থ অবিশ্বাস তখনও দেখা যায়নি। এই মতবাদের বিরোধিতা হয়েছে, পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তিকে কখনও স্পর্শ করেনি। সকল ধর্মের উৎস এক, এমন ধারণাই সেই ভিতকে নাড়িয়ে দিল। ধর্ম যদি মূলত এক হয়, তাহলে মানুষের আধ্যাত্মিক ঐক্যের পথে বিভিন্ন ধর্মের নানা মতবাদ ও গোঁড়ামি যে বাধার সৃষ্টি করে তা দূর

করা জরুরি। কিন্তু মতবাদ ও গোঁড়ামি বাদ দিলে ধর্মও যে আর দাঁড়াবার ঠাঁই পায় না। সকল ধর্মের মূল এক, এই বৈপ্লবিক ধারণা প্রথম দেন আরব চিন্তাবিদরা।

ইবন্ রুশদ্-এর সময় আরব সাধনার চরম উন্নতি হলেও নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে অগণিত চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ একজন মাত্র। ইসলামের মূলনীতি এবং 'ঈশ্বরের তলোয়ার'-এ তার বিস্ময়কর সাফল্যের ফলে যে জ্ঞান প্রসার সম্ভব হয়েছিল, তারই বৈপ্লবিক তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এদের মধ্যে যারা বেশি নিষ্ঠাবান তাদের মূল বক্তব্যে।

ঐশ্বরিক একত্ববাদের ইহলৌকিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তার সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরই নতুন মুসলমান জাতি বুদ্ধিবৃত্তিচর্চায় আত্মনিয়োগ করল। শতবর্ষব্যাপী তারা একান্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে। এভাবে নিজেদের সমৃদ্ধ করে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তারা স্বাধীন ও মৌলিক বক্তব্য উপস্থাপন করলেন।

আল্ কানদ্ ছিলেন প্রথম এবং প্রখ্যাত আরব দার্শনিক। মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন আব্বাসীয়দের রাজধানীতেই তার বিকাশ ঘটেছিল। নবম শতাব্দীর গোড়াতেই তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হন। তার শিক্ষা হলো, গণিতের ওপর ভিত্তি করেই দর্শনকে দাঁড়াতে হবে, অর্থাৎ মনগড়া কল্পনা হলে চলবে না। মানুষের মনন প্রণালীকে ফলপ্রসূ হতে হলে তাকে পরিচালিত হতে হবে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং বাস্তব ঘটনাবলী সমর্থিত সূক্ষ্ম যৌক্তিকতায়। আধুনিক দর্শনের অগ্রদূত ফ্রান্সিস বেকন এবং ডেকার্টের সাতশ' বছর আগে এই তত্ত্বের শিক্ষক অবশ্য অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। আজও এমন অনেক 'দার্শনিক' এবং 'পণ্ডিত' আছেন যারা হাজার বছর আগের এই আরবীয় পণ্ডিতের শিক্ষা থেকে উপকার পেতে পারেন।

এরপরে নাম আসে আল্ ফারাবির। তিনি এর পরবর্তী শতাব্দীর লোক এবং দামেস্ক ও বাগদাদে শিক্ষকতা করতেন। এরিস্টটল সম্বন্ধে তার বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্য হিসেবে যুগ যুগ ধরে গৃহীত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ। রজার বেকন তার কাছে গণিত শেখেন।

ইবন্ সিনা আসেন দশম শতাব্দীর শেষদিকে। বোখারার এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে তার জন্ম ও অবস্থান। তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে লিখেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবদানের জন্যই তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

স্যালারমোর বিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যালয় তারই স্মৃতি বহন করে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে তার রচনাই চিকিৎসাবিজ্ঞানে পাঠ্যবই হিসেবে নির্ধারিত ছিল। এই বিখ্যাত চিকিৎসাবিদের দার্শনিক মতামত এতই উদার ছিল যে, বোখারার মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন আমিরও ইবন্ সিনার ধর্মহীনতায় বিচলিত ইমামদের চাপ এড়াতে পারেননি। তাকে পৃষ্ঠপোষকের দরবার ছেড়ে যেতে হলো। চিকিৎসাবিদ্যা

শিখিয়ে এবং নিজের মতামত প্রচার করে ঘুরে বেড়ালেন আরব রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে।

একাদশ শতাব্দীর আল হাসান সকল যুগের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সারিতে আসন পেতে পারেন। দৃষ্টিবিজ্ঞান ছিল তার বিশেষ বিষয়। গ্রিকদের কাছ থেকে শিখেও তিনি তাদের ছাড়িয়ে যান। চোখ থেকে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, তাদের এই ভুল ধারণা তিনিই শুধরে দেন। শরীর ব্যবচ্ছেদ এবং জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে আল হাসান বুঝিয়ে দিলেন যে, দৃষ্টবস্তু থেকেই আলোকরশ্মি আসে এবং রেটিনার উপর তা প্রতিফলিত হয়। বিজ্ঞানে ঐতিহাসিকরা বলেন এবং তা বিশ্বাসযোগ্যও যে, কেপলার তাঁর দৃষ্টিবিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা পেয়েছিলেন এই আরব বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকেই।

আন্দালুসিয়ার ব্যবসায়ীর ছেলে আল গাজ্জালি এই শতাব্দীরই মানুষ। আত্মসচেতনতাই সত্য নির্ধারণের মাপকাঠি, তার এই বক্তব্য ছিল ডেকার্টের তত্ত্বেরই পূর্বাভাস। তিনিই প্রাচীন ও আধুনিক সংশয়বাদের যোগসূত্র হয়ে রইলেন। দর্শনে তার অসাধারণ অবদান তার নিজের কথায় শোনাই ভালো : 'ধর্ম থেকে কোনো তৃপ্তি পেতে ব্যর্থ হয়ে সকলের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা সাব্যস্ত করলাম। আর সন্দেহহীন ছেলেবেলায় যে বিষয়গুলো ছাপ ফেলেছিল তা থেকেও নিজেকে মুক্ত করবো। আমার লক্ষ্য কেবল বস্তুর সত্যরূপ জানা। ফলে জ্ঞান কী, তা জানা আমার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এটা আমি সহজেই বুঝতে পারি যে, ভবিষ্যতের সকল ভুল এবং জল্পনা-কল্পনাকে অসম্ভব করে যে জ্ঞান জানার বিষয়কে সন্দেহাতীত ও সহজবোধ্য করে তোলে, সেই জ্ঞানই আসল জ্ঞান। এভাবে আমি যদি একবার জানি যে, দশ তিনের চেয়ে বেশি, আর যদি কেউ বলেন, না, তিন দশের চেয়ে বেশি এবং তা প্রমাণ করতে আমি এই লাঠিকে সাপে পরিণত করব। আর সত্যি যদি সে কোনো অলৌকিক কিছু করেই ফেলে তবু তার ভুল সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস অটুট থাকবে। তার কৌশল এবং সামর্থ্যে আমি বিস্মিত হব হয়ত, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে আমি অটলই থাকব।'

প্রায় হাজার বছর আগে এই মুসলিম মনীষী নির্ভুল জ্ঞান লাভের যে পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছিলেন তা তখন যেমন ছিল, আজও তেমনি মূল্যবান হয়েই আছে। যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে জ্ঞান লাভ সম্ভব করে তুলতে পারে, ভারতবাসীর মধ্যে এখনও তার প্রসার অনেক কম। কারণ ভারতবাসী বিংশ শতাব্দীর এই দিনেও ঐন্দ্রজালিক অসাধারণতা এবং 'আধ্যাত্মিক' অলৌকিকতার প্রভাবে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে চান, যা বিজ্ঞানের সত্যকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করে।

আল্ গাজ্জালি মনে করতেন জ্ঞানকে যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার পথে না পাওয়া যায়, আর যদি অখণ্ডনীয় নিয়ম দিয়ে বাঁধা না যায়, তাহলে সে জ্ঞান কখনও গাণিতিক

সম্পূর্ণতা পায় না। তার মতে ইন্দ্রিয়-অনুভূতি এবং অবধারিত সত্য অর্থাৎ হেতুবাদের সাহায্যেই সন্দেহাতীত প্রত্যয় লাভ সম্ভব। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় উপলব্ধির মানদণ্ড পেয়েছিলেন যুক্তিতে অর্থাৎ আত্মসচেতনতায়। যে ধর্মকে সাধারণত উগ্র এবং অসহিষ্ণু মনে হয়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে তারই চিন্তায় এমন অপরূপ তেজস্বিতা দেখে সত্যি বিস্মিত হতে হয়। তবুও আল্ গাজ্জালির সংশয়বাদ তাঁর সময়ে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। দর্শনের ইতিহাসে তাঁর অবস্থান সম্বন্ধে প্রখ্যাত ফরাসি প্রাচ্য বিশারদ রেনা (Renan)-র মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, আধুনিক সংশয়বাদের জন্মদাতা হিউম তাঁর সাতশ' বছর আগের এই আরব দার্শনিকের কথার ওপর একটি কথাও বলতে পারেননি। আল্ গাজ্জালির মতামতের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের গভীরতা আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যখন আমরা মনে করি যে, হিউমের সংশয়বাদই কান্টের 'অন্ধবিশ্বাস বিনাশী যুক্তিনিষ্ঠ দর্শন'কে শক্তি জুগিয়েছে, কঠিন কুঠারাঘাত হেনেছে সকল চিন্তা বিলাসিতার মূলে। কিন্তু আল্ গাজ্জালির মতবাদ ছিল তার সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। প্রয়োগপরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যে রূপ তিনি কল্পনা করেছিলেন, তা এখনও সম্ভব হয়নি। কারিগরি সুবিধার অভাব কিংবা অপরিণত রূপের জন্য, দার্শনিকরা যেভাবে চেয়েছিলেন, বস্তুর প্রকৃতিকে সেভাবে গণিত শাস্ত্রের মতো নির্ভুল করে জানা যায়নি। এজন্য শেষ জীবনে আল্ গাজ্জালি রহস্যবাদের মোহজালে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর এই বিচ্যুতি কান্টের বিচ্যুতির মতো অসম্মানজনক নয়। বাস্তব উপকরণের অভাব এই আরব চিন্তাবিদের নিঃশঙ্ক আকাশচারী গতিকে ছেঁটে দিল। আর কান্টের প্রমাণাভিসারী প্রতিভাকে ঢেকে দিল শ্রেণী-স্বার্থের প্রতি তার আকর্ষণ।

দ্বাদশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ আবু বকরই গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান বিষয়ে টলেমির ধারণাকে প্রথম বর্জন করলেন। তিনি বললেন, গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে এক অদ্ভুত শৃঙ্খলা এবং দিব্যগতি আছে। তাঁর এই ধারণাই জিওরডানো ব্রুনো (Giordano Bruno), গ্যালিলিও এবং কপারনিকাসের যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব করে তোলে। ইতিহাসে একথা লেখা আছে যে, 'তার পদ্ধতিতে সকল গতিবিধি নিরীক্ষা করা হয়েছিল এবং কোথাও কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি।' তার মতবাদ বিষয়ে কোনো গবেষণা গ্রন্থ রচনার আগেই তিনি মারা যান। গ্রহরাজি নিয়মমাফিক চলে, তার এই মতবাদকে জনপ্রিয় করেন তার শিষ্য আল্ বিতরুজি। সমগ্র মধ্যযুগে তার মতবাদকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান বলে মেনে নেয়া হয়। একজন মুসলমান দার্শনিকের শিক্ষা, জগৎ সম্বন্ধে বাইবেলের মতবাদকে উল্টে দেয় এবং তা খ্রিস্টীয় চার্চের ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করে। কেবল রজার বেকনই নন, তাঁর স্বনামখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বী আলবার্টাস মাগনাসও আল্ বিতরুজির জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঋণ স্বীকার করেছেন; আর এতে বিশ্লেষিত হয়েছে গ্রহরাজ্যের গতি সম্বন্ধে আবু বকরের মন্তব্য।

আরবীয় চিন্তাবিদদের সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম ইবন্ রুশদ্-এর দর্শনের মূল কথা আগেই বলা হয়েছে। তার অবস্থান ছিল ইসলামের সংস্কৃতির ঘোর সংকটকালে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এই সংস্কৃতি উন্নতির চরমে পৌঁছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোও প্রগতির পথ রোধ করার মতো শক্তি অর্জন করে। ইসলামী সংস্কৃতি তখন ধ্বংসের দোরগোড়ায়।

একটি যাযাবর জনগোষ্ঠী সরল ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে চিন্তার যে স্বাধীনতা পেয়েছিল তা ক্রমে এত নির্ভীক হয়ে উঠল যে, 'বিশ্বাসীর সেনাধ্যক্ষের' ঐশ্বরিক স্বার্থের সাথে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। পাঁচশ' বছর ধরে ইসলামের চিন্তাধারার যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ ফলাফলের মূল কথা প্রকাশ করতে গিয়ে ইবন্ রুশদ্ যখন তার এই বিপ্লবী মতামতের কথা বললেন যে, বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিই সত্যের একমাত্র উৎস, তখন পুরোহিতদের চাপে পড়ে কার্ডোভার সুলতান আল্ মনসুর ধর্মের কর্তৃত্বের দাবিতে এই ধর্মবিরোধী মতামতের জন্য নরকাগ্নির ভয় দেখিয়ে রাজানুশাসন (edict) জারি করলেন। ইসলাম যখন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অস্বীকার করল তখনই শুরু হলো তার অবনতি। মানব সভ্যতার উন্নতির চালিকাশক্তির পরিবর্তে সে হয়ে পড়ল প্রতিক্রিয়া, অসহিষ্ণুতা, অজ্ঞতা আর অন্ধবিশ্বাসের অস্ত্র। দুটি সাম্রাজ্যের ধবংস এবং আরও দুটিকে ধর্মের অন্ধকার গহ্বর থেকে প্রাচীন সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করে ইসলাম তার যথাযথ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন শেষ করল। আর তার মৌলিক রূপের প্রতি কটাক্ষ করে অবশেষে তুর্কি বর্বরতা তার মালিকদের লুটতরাজের কালো পতাকার চেহারায় আত্মপ্রকাশ করল।

ইসলাম নিজেকেই অস্বীকার করল। শত শত বছরের স্বাধীন চিন্তার আবাস ভূমি কর্ডোভার রাজসভা থেকে ইবন্ রুশদ্ বিতাড়িত হলেন। তার বইগুলো আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, যদিও আসল আগুনে নয়, তার চেয়েও নৃশংসভাবে নির্বাসন দেয়া হলো যাজকীয় প্রতিক্রিয়ায়। যুক্তবাদকে বলা হলো ধর্মদ্রোহিতা। ইবন্ রুশদ্ এবং তার গুরু এরিস্টটলকে দেয়া হলো অভিসম্পাত। কালক্রমে প্রতিক্রিয়ার জয় হলো। পরিণতি এমন হলো যে, গোঁড়া মুসলমানদের কাছে দর্শন হয়ে দাঁড়াল অধার্মিকতা, অসাধুতা এবং পাপাচারের শামিল। কিন্তু আরবরা পাঁচশ' বছর ধরে আধ্যাত্ম উন্নতির মানকে প্রশংসনীয়ভাবে উজ্জ্বল করে রেখেছিল এবং সামনে এগিয়ে নিয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের অন্ধ সংস্কারের কারণে আধ্যাত্ম উন্নতির মান যতটুকু নিচে নেমেছিল এবং পদদলিত হয়েছিল, ইসলামের অসহিষ্ণুতার ফলে তারচেয়ে বেশি হয়নি। আপন মানুষদের কাছে ইবন্ রুশদ অস্বীকৃত হলেও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকাররা তাকে রাজার সম্মান দিল। বিশ্বাস আর বুদ্ধির মধ্যে, অজ্ঞতার স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীন চিন্তার মধ্যে যে সংঘাত; দ্বাদশ থেকে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যা ইউরোপকে টলিয়েছিল আর কাঁপিয়ে দিল ক্যাথলিক চার্চের ভিত্তিমূলকে তা ছিল আরব দার্শনিকদের শিক্ষারই অনুপ্রেরণা। ইবন্ রুশদ্ এবং ইবন্ রুশদবাদ চারশ' বছর ধরে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে।

অধ্যায় সাত

ইসলাম ও ভারতবর্ষ

যদিও প্রগতিশীল ভূমিকা থেকে সরে আসা এবং এর নেতৃত্ব শিক্ষিত সংস্কৃতমনা আরবদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার পর ইসলাম ভারতবর্ষে এসেছিল তবুও এর পতাকায় খচিত ছিল প্রতিষ্ঠাকালীন বৈপ্লবিক নীতি ও প্রাধান্য। ইতিহাসের বিশ্লেষণী পাঠে দেখা যায় পারস্য এবং খ্রিস্টান দেশগুলোর মতো স্থানীয় (এ দেশীয়) কিছু ঘটনা ভারতবর্ষেও মুসলিম বিজয়ের পথকে সুগম করেছিল। বিজিত জাতির বিপুল জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না হলেও অন্তত মৌলিক সহানুভূতি বা মৌন সম্মতি না পেলে কোনো বিদেশি আক্রমণকারীই সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং কোনো প্রাচীন সভ্য জাতিকে সহজে জয় করতে পারে না। ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি বৌদ্ধ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করায় প্রচলিত ধর্মবিরোধী অগণিত মানুষ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আশ্রয়হীন নির্যাতিতের মতো দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তারাই ইসলামের বাণীকে সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল ।

ব্রাহ্মণ শাসকদের নিপীড়নে পীড়িত জাঠ এবং অন্যান্য কৃষিজীবীদের সক্রিয় সহযোগিতায় মোহাম্মদ ইবন্ কাশিম সিন্ধু জয় করলেন। রাজ্য জয় করেই তিনি প্রথম আরব বিজেতাদের (রাজ্য শাসন) পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। 'ব্রাহ্মণদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার ভার দিলেন তাদেরই। অবাধ স্বাধীনতা দিলেন তাদের মন্দির মেরামত করার, পুরো অধিকার দিলেন নিজ নিজ ধর্ম পালনের। রাজস্ব আদায়ের ভার রইল তাদের হাতে। আর আদিম ব্যবস্থার স্থায়ী শাসক পরিচালনার জন্য তাদেরকেই নিযুক্ত করলেন।' (Elliot : Histrory of India) যখন ব্রাহ্মণরা, অন্তত তাদের কেউ কেউ ম্লেচ্ছদের দিকে ঝুঁকতে লাগলেন তখন দেশের সামাজিক অবস্থা যে খুব স্বাভাবিক ছিল তা বলা যায় না। সমাজ এমন বিশৃঙ্খল ও অস্থির ছিল যে, তাদের সুবিধাভোগীদের অবস্থাও তেমন নিরাপদ ছিল না। এই-ই প্রতিবিপ্লবের স্বাভাবিক চেহারা। বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ে বিপ্লব হয়তো দমন করা যায়, কিন্তু সমাজের যে নোংরা বিশৃঙ্খলতা থেকে বিপ্লবের উৎপত্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তা দূর করতে পারে না। ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরাজয় ঘটেনি, বরং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণেই তা ব্যর্থ হয়েছে। এই বিপ্লবকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সমাজশক্তি তেমন দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। যার ফলে বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সাথে সাথে সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচার বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক বিশৃঙ্খলায় ডুবে গেল। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র সমাজ তখন ধবংস আর বিলুপ্তির কবলে। এ কারণে নিপীড়িত জনগণ এসে ভিড় করল ইসলামের পতাকাতলে। আর ইসলামও রাজনৈতিক সমানাধিকার না হোক, অন্তত সামাজিক সমানাধিকার দিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর

লোকরাও স্বার্থের খাতিরে সাহায্য চাইল বিদেশি আক্রমণকারীদের কাছে। এ থেকে মনে হয় যে, জনগণ যখন নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে, তখনই উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের নৈতিক স্খলন দেখা দিয়েছে।

প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির উগ্র সমর্থক হ্যাভেলের মুসলমানদের প্রতি কোনো সহানুভূতি কিংবা উদার মনোভাব ছিল তা ভাবা যায় না। অথচ ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশ মজার বিবরণ দিয়েছেন : 'যারা ইসলাম গ্রহণ করল তারা মুসলমান প্রজার সব রকম আইনি অধিকার পেল। আর্য আইন দিয়ে নয়, কোরআনের আইনে সব মামলা নিষ্পত্তি হতো। এভাবে ধর্মান্তরিত করার পদ্ধতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বিশেষ করে যেসব অস্পৃশ্য হিন্দুগোষ্ঠী নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল তাদের মধ্যে খুব কার্যকর হলো।' (Aryan Rule in India)

ব্রাহ্মণ্য আইনের বিশুদ্ধতায় ঘোর বিশ্বাসী কারো কাছ থেকে এ ধরনের উক্তি মোটেই প্রশংসার নয়। সে যা-ই হোক, এটা পরিষ্কার যে, মুসলমান বিজয়ের সময় ভারতবর্ষে এমন অসংখ্য মানুষ বসবাস করত যারা বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে হিন্দু আইন এবং ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। আর সে কারণেই তারা তাদের ঐতিহ্য ছেড়ে ইসলামে পক্ষপাতহীন আইন-কানুন গ্রহণ করেছে যা তাদের আশ্রয় দিয়েছে বিজয়ী হিন্দু প্রতিক্রিয়ার জুলুম থেকে।

আরও এক জায়গায় হ্যাভেল আরব নবীর শিক্ষার আধ্যাত্মিক মূল্যকে ছোট করে দেখেছেন, কিন্তু একই সাথে ভারতে ওই শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। 'ইসলামের দর্শন নয়, বরং তার সামাজিক কর্মপদ্ধতিই ভারতবর্ষে এত ধর্মান্তরিত মানুষ পেয়েছে।' অবশ্য আমজনতার কাছে দর্শনের কোনো অবেদন নেই। তারা সবসময় 'সমাজভিত্তিক কর্মসূচি' গ্রহণ করে, যা তাদের উন্নততর জীবনধারণের কথা বলে। সমাজের যে নিয়ম-কানুন নিপীড়িত জনমনের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে, নীচুমানের দর্শন অর্থাৎ জীবনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। ইসলামের সমাজ ব্যবস্তার দর্শন ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করার কারণ জীবনের প্রতি এর যে দৃষ্টিভঙ্গি তা ছিল হিন্দু দর্শনের চেয়ে অনেক উন্নত। হিন্দু (সমাজ) দর্শন সমাজে নানা বিশৃঙ্খল এনেছিল আর ইসলাম তা থেকে মুক্তির পথ দেখাল ভারতীয় জনগণকে। উপরের মন্তব্যে হ্যাভেল স্বীকার করলেন যে, তখনও সমাজ বিপ্লবে তার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি এবং এর সমাজ বিপ্লবী বৈশিষ্ট্যের কারণেই ভারতবর্ষের মাটিতে এমন দৃঢ় হলো। এমনকি ইসলামের বিকৃতি ও অবনতির দিনেও হিন্দু গোঁড়ামির তুলনায় ইসলাম আত্মিক, আদর্শিক ও সামাজিক প্রগতির পরিচয় দিয়েছে।

হ্যাভেল ইন্দো-ইউরোপীয় সংস্কৃতির একজন বিখ্যাত প্রশংসাকারী, যাকে তিনি মানুষের দৃষ্টি প্রতিভার চূড়ান্ত ও মহত্তম নিদর্শন বলেই মনে করতেন। তিনি মানুষের

সৃষ্টি প্রতিভার চূড়ান্ত ও মহত্তম নিদর্শন বলেই মনে করতেন। অন্যদিকে মুসলমানদের প্রতি তার ছিল প্রবল বিদ্বেষ। তার মন্তব্যকে হিন্দু বিদ্বেষী বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আসলে তার পক্ষপাতিত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দিকে। সুতরাং তার মতো ঐতিহাসিক যদি অতীত ভারতবর্ষে অপ্রীতিকর ও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে দেখেন, তাহলে অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তা মানতেই হবে। তিনি লেখেন : 'ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয়কে বাইরের কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা সম্ভব হয়েছিল মূলত হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সমগ্র আর্যাবর্তে যে রাজনৈতিক অধঃপতন হয়েছিল সেই কারণেই। নবীর সামাজিক কর্মসূচি সকল মুসলমানকে দিয়েছে সমান আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করেছে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলনভূমি, যা তাকে দিয়েছে বিশ্ব শাসনের ভার। বিশ্বকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের সুখীজীবন বিধান হিসেবে ইসলামই যথেষ্ট। উত্তর ভারতে যখন বৌদ্ধ দর্শন এবং ব্রাহ্মণ্য মতবাদের গোঁড়ামির সংঘর্ষ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের সৃষ্টি করল, সেই সংকটে ইসলাম তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে।' (Aryan Rule in India)

সপ্ত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় রাজা হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। এভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা আর ইসলামের অভ্যুত্থান সমান্তরালভাবেই চলেছে। একজন রাজার মৃত্যু, তিনি যত বড়ই হন না কেন, তা ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে না। এর ধারা চলছিল শত শত বছর ধরে। বৌদ্ধ বিপ্লব একে কিছুদিনের জন্য থামিয়ে রেখেছিল। এর পরাজয়ের পর অবস্থা আরও ক্ষিপ্র, বেগবান ও তীব্র হলো। দেখা যায় বৌদ্ধ আশ্রমের পতন এবং সমগ্র ভারতীয় সমাজের ওপর এর প্রভাব ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়কে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, খ্রিস্ট চার্চ যেমন অন্যান্য জায়গায় করেছিল।

গজনীর মাহমুদের অভিযান সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে হ্যাভেল আরও লেখেন। 'যুদ্ধে তাঁর বিজয় ছিল প্রায় অনিবার্য, তাই তার সম্মান বাড়িয়ে তুলেছি। অস্বাভাবিকভাবে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের অশিক্ষিত যদ্ধপ্রিয় যে জাতিগুলোর কাছে যুদ্ধই ছিল ধর্ম আর যুদ্ধে জয়লাভই প্রেরণার মূল উৎস, তাদের অনেকেই ইসলামে দীক্ষিত হলো।' (Aryan Rule in India) স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা যে বিশ্বাসে মন্দিরের দেব-দেবীর পদতলে অর্ঘ্য নিবেদন করে এসেছে, মাহমুদের অভিযান তাদের সেই দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাসের মূলে আঘাত না করে পারেনি। যার ফলে মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতিতে যে সহজাত ধর্মীয় অনুভূতি ছিল আর তার অধিষ্ঠাতা দেবতার প্রতি যে বিশ্বাস ছিল, তার মূলেও আঘাত লাগল এবং নড়বড়ে হয়ে পড়ল। এমন অবস্থায় 'ধর্মানুভূতি ও আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিই' জনগণকে নিষ্ক্রিয় ও অকর্মণ্য দেবতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের অন্তরের ভক্তি-ভালোবাসাকে আরও শক্তিশালী ঈশ্বরের আরাধনায় উৎসাহিত

করল। কারণ তার প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর উপাসনায় জনগণ সেসময়ে আশাতীতভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। থানেশ্বর, মথুরা ও সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত মন্দিরগুলোতে যে যে দেবতার পূজা হতো তাদের অলৌকিক শক্তির প্রতি যুগ-যুগ ধরে লাখ লাখ মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে। এই শক্তিশালী দেবতাদের আশ্রয়ে তাদের নিরাপদ করতে পারবে এই আশ্বাসের ছলনায় ভুলিয়ে অসংখ্য সরল বিশ্বাসী মানুষের কাছ থেকে মন্দিরের পুরোহিতরা প্রচুর টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল যুগ যুগ সঞ্চিত ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের সশ্রদ্ধ কাঠামো এই বিধর্মী আক্রমণকারীর নিষ্ঠুর আঘাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। মাহমুদের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে এলে পুরোহিতরা লোকজনদের বলেছেন দেবতার ক্রুদ্ধ হিংসায় আক্রমণকারীরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যদি কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে, মানুষজনও পরম বিশ্বাসে সেদিকেই চেয়ে রইল। কিন্তু তা কিছুতেই ঘটল না। বরং তা ঘটেছে আক্রমণকারীদের ঈশ্বরের দ্বারাই। অলৌকিকতার ওপর ভিত্তি করা বিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে আরও অলৌকিক হবে। সকল প্রচলিত ধর্মের ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায়, সেই সংকটকালে যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন তারাই ছিলেন সবচেয়ে বড় ধার্মিক।

ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কারণগুলোর সূক্ষ্ম অনুসন্ধান আজ বাস্তব মূল্য বহন করে। একজন গোঁড়া হিন্দু যে তার মুসলমান প্রতিবেশীকে ছোটলোক ভাবে, সেই পূর্বসংস্কার দূর হবে। পূর্বধারণা থেকে মুক্ত হলেই হিন্দুরা ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের গঠনমূলক পরিণতির কথা বুঝতে পারবেন। তা দেবে বিজয়ীর প্রতি বিজিতের ঘৃণা দূর করার প্রেরণা। ধীর শান্তভাবে ইতিহাস উপলব্ধি দিয়ে যতদিন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন না আসছে, ততদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন হতে পারে না। প্রাচীন সভ্যতা ধবংস হয়ে গেলে সেই বিশৃঙ্খল ধবংসস্তূপ থেকে ভারতীয় সমাজকে বাঁচাতে মুসলমানদের যে অপরিহার্য ভূমিকা তা যতদিন বুঝতে না পারবে ততদিন মুসলমানরা যে ভারতবর্ষের এক অখন্ড অংশ, হিন্দুরা তা বুঝতে পারবে না। তাছাড়া, ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন যে সার্থক তার নির্ভুল ধারণা থেকে জানা ইতিহাসবোধ আমাদের বর্তমান দুর্ভাগ্যের গভীরতম কারণগুলো নির্ধারণ করতে আর তা সমূলে দূর করতে যথার্থ সহায়তা দেবে।

অন্যদিকে, তাদের বিশ্বাস দিয়েই, ইসলাম ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে যে চমৎকার ভূমিকা পালন করেছে আমাদের সময়ের অন্তত কিছুসংখ্যক মুসলমান সে সম্বন্ধে সচেতন হবেন। কোরআনের শিক্ষার বাইরে বলে আরবদের যুক্তি ও সংশয়বাদকে অনেকেই অস্বীকার এবং পরিহার করতে পারে। কিন্তু একথা সত্যি যে, ইসলাম ইতিহাসে এক স্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছে। আরব দার্শনিকদের প্রাথমিক অবিশ্বাস এবং অধার্মিকতা দিয়ে তা যতটা সম্ভব হয়েছে পরবর্তী সময়ের

প্রতিক্রিয়াশীল পুরোহিততন্ত্রের অর্থাৎ মোল্লাতন্ত্রের প্রসার কিংবা ধর্মান্তরিত তাতারদের করুণ ধর্মোন্মত্ততায় তা হয়নি। ভারতবর্ষে আসার আগেই ইসলাম তার প্রগতিশীল ভূমিকার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে বিপ্লবী আরবরা তাদের পতাকা ওড়ায়নি, উড়িয়েছে ইসলামে দীক্ষিত মধ্য এশিয়ার বর্বররা আর বিলাস বৈভবে আদর্শচ্যুত পারস্যবাসীরা। মোহাম্মদের স্মৃতিবাহী বিশাল কীর্তিস্তম্ভ আরব সাম্রাজ্যকে এরাই বিপর্যস্ত করেছে। তবুও ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ বিপ্লব যখন পর্যুদস্ত হলো, যা ভারতবর্ষের সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল, তা থেকে স্বস্তি ও মুক্তি পেতে অসংখ্য মানুষ ইসলামের বার্তাকে স্বাগত জানল। ভারতবর্ষের পারসি কিংবা মোগল বিজেতাদের কেউ-ই আরব বীরদের ঐতিহ্যবাহী মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা এবং উদারতা থেকে নিজেদের একেবারে দূরে সরিয়ে ফেলেননি।

আসল সত্য হলো দূরদেশ থেকে আসা তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটি হানাদার লুণ্ঠনকারী দল দীর্ঘদিন একটি বিশাল দেশের শাসক হয়ে রইল। আর তাদের ভিনদেশী বিশ্বাস পেল লাখ লাখ বিশ্বাসী। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের অনেকটাই তারা মেটাতে পেরেছিল। এমনকি প্রতিক্রিয়ার ভারে যখন তার বৈপ্লবিক উত্তাপ অনেকটা কমে গেছে তখনও। তারপরও ইসলাম হিন্দু সমাজে অনেক বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে। আক্রমণকারী শক্তির বলে ভারতবর্ষে মুসলিম প্রভাব যতটা না সংহত হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে ইসলামের বিশ্বাস এবং ইসলামী আইন-কানুনের প্রগতিশীল গুরুত্বের জন্য।

এমনকি কঠিন উগ্র মুসলিমবিরোধী হ্যাভেল নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করেছেন : হিন্দু সমাজ জীবনে মুসলমান রাজনৈতিক মতবাদের ফল ফলেছে দু'ভাবে, একদিকে জাতিভেদের গোঁড়ামিকে শক্তিশালী করেছে, অপরদিকে এর বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেছে এক বিদ্রোহ। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে প্রলুব্ধকর ভবিষ্যতের ছবি, তাতে মরুভূমির বেদুইনদের মতো তারাও আকৃষ্ট হয়েছে। (যা) শূদ্রকে দিয়েছে মুক্ত মানুষের অধিকার আর ব্রাহ্মণদের উপর প্রভুত্বের ক্ষমতা। ইউরোপের পুনর্জাগরণের মতো এ-ও চিন্তা জগতে এক জোয়ার এনেছে, সৃষ্টি করেছে অগণিত দৃঢ় মানুষ আর কিছু আকস্মিক মৌলিক ভব্যতা; যার জন্যে তাঁর ছেড়ে যেতে হয়েছে যাযাবরদের আর শূদ্রদের ফেলে যেতে হয়েছে নিজ গ্রাম। এ থেকে সৃষ্টি হলো উচ্ছল জীবন উপভোগকারী এক ধরনের মানবতা।' (Aryan Rule in India)

এই উজ্জ্বল আলোপ্রদায়ী মন্তব্যের সঙ্গে শুধু এটুকু যোগ করলেই হয় যে, মুসলিম বিজয়ে সমাজে যে আঘাত লাগল তার ফলেই কবীর, নানক, তুকারাম. চৈতন্য প্রমুখ সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটল; যারা ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামির বিরুদ্ধে একটা জনপ্রিয় বিপ্লব সংগঠিত করে গেছেন।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস পড়লে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের উন্নাসিকতাকে হাস্যকর বলে মনে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে অবমাননা করে এবং দেশের ভবিষ্যৎকে আহত করে। মুসলমানদের কাছে শিখেই ইউরোপ আধুনিক সভ্যতার নেতা হয়ে রইল। এমনকি আজও এর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা অতীতের ঋণ স্বীকার করতে লজ্জা পায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ইসলামের ঐতিহ্য থেকে ভারতবর্ষ তেমন উপকৃত হতে পারেনি; কারণ এরকম সম্মানের অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা তাদের ছিল না। এখনও এই বিলম্বিত পুনর্জাগরণ সৃষ্টির বেদনায় মানব ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে প্রেরণা নিয়ে ভারতবর্ষবাসী, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, ব্যাপক লাভবান হতে পারেন। মানবসভ্যতায় ইসলামের দান সম্বন্ধে জ্ঞান এবং ওই দানের ঐতিহাসিক মূল্যের যথার্থ অনুধাবন হিন্দুদের উদ্ধত আত্মপ্রসাদের মূলে আঘাত করবে এবং আমাদের এই যুগের মুসলমানদেরও সংকীর্ণ মানসিকতা মুক্ত করে, তারা যে ধর্মে বিশ্বাসী, তার যথার্থ মর্মবাণীর মুখোমুখি করে দেবে।